আফ্রিকার লোকগল্প

অশোককুমার মিত্র

AFRICAR LOKOGALPO

[A Children Folktales of Africa]
by
Ashok Kumar Mitra
First Published
Book Fair 2014
ISBN 978-81-7332-697-4

'আফ্রিকার লোককথা' রাশিয়ান সংস্করণ

থেকে ছবিগুলি সংগৃহীত

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০১৪
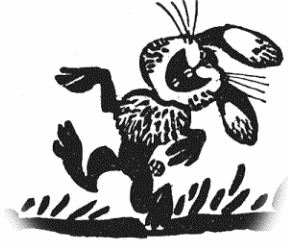
কেমন করে গল্প এল

আফ্রিকার লোকেরা বলে—

ইঁদুরের তো সর্বত্র আনাগোনা, মস্ত বড়োলোকের বাড়িতে সে যেমন যায়, আবার একেবারে হাভাতের বাড়িতেও তার পায়ের ছাপ পড়ে।

অনেক অনেক অনেককাল আগে—এমনি নানা জায়গায় যেতে যেতে, ইঁদুর যা দেখে, তা নিয়ে অনেক গল্প তৈরি করে। এই গল্পগুলোই হল ইঁদুরের ছেলেপুলে। আর প্রতিটি বাচ্চারই হল একেক রকম পোশাক। কারও সাদা, কারও নীল, কারও বা লাল, কারও সবুজ। কারও হলদে, কারও কালো—এমনি কত। গল্পরা সব তার কাছে থাকত, ইঁদুর বাইরে বেরুলে তার সব কাজ তারা সেরে রাখত।

একদিন হল কী! ইঁদুর বাড়ি নেই—এমন সময় এক ভেড়া এসে তার বাঁকানো শিং দিয়ে ইঁদুরের দরজায় দিয়েছে এক গুঁতো । জোরালো গুঁতো। অনেক দিনের পুরোনো দরজা, সে গুঁতোর ধাক্কা সইতে পারেনি, হুড়মুড় করে পড়েছে ভেঙে। আর ভাঙা দরজার ফাঁক গলে গল্পের দলও ছুটে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। ছুটতে ছুটতে তারা একেক জনে একেক দেশে হাজির হল—ছড়িয়ে গেল সব দেশে।

সেসব গল্পের কিছু বরং বলি তোমাদের।

চুপটি করে শোনো।

গাধার মা

এক ছিল বুড়ি। তার ছিল দুটো গাধা। রোজ সকালে তাদের নিয়ে বুড়ি গাঁয়ের ধারে এক খেতে চরাতে যেত। একদিন সকালে বুড়ি রোজকার মতো গাধা নিয়ে খেতে যাচ্ছে, পথে এক ছোকরার সঙ্গে দেখা। বুড়ির সঙ্গে গাধা দুটোকে দেখে সে মজা করে বলল, সুপ্রভাত, গাধার মা। এই সকালে চললে কোথা?

বুড়িও কম যায় না। সে মুচকি হেসে জবাব দিল, ছেলে আমার, ভালো আছো তো? তোমার ভাইদের এই একটু খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি।

ব্যাঙ্ দুটো

একদিন হল কী—দুটো ব্যাঙ্ এক মাখনের পাত্রের ভেতরে পড়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও তারা পাত্রটির বাইরে বেরুতে পারল না। পাত্রের চারধারে মাখনের মধ্যে তারা ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরতে ঘুরতে হতাশ হয়ে একটা ব্যাঙ্ বলল, ওঃ, আর পারি না—এবারে বুঝি মলাম। বলল আর সে অমনি মরল।

আরেক ব্যাঙ্ কিন্তু ঘোরা থামাল না—সে ঘুরতেই লাগল। ক্রমে মাখন জমে একটা শক্ত বলের মতো হল। ব্যাঙ্টা অমনি বলের ওপর চড়ে লাফিয়ে মাখনের পাত্রটির বাইরে বেরিয়ে এল।

একটি ধূর্ত বেড়াল

যখন বেড়ালটার বয়স কম ছিল, তেজ ছিল বেশি, গায়ে ছিল ঢের জোর, তখন সে অনেক ইঁদুর মেরেছে। ক্রমে তার বয়স বেড়েছে, শেষে বুড়ো হয়েছে, তার তেজ গিয়েছে ঝরে, শক্তি ফুরিয়েছে। এখন আর তেমন ইঁদুর ধরতে পারে না।

ইঁদুর ধরতে পারে না। খাওয়াও জোটে না। এভাবে তো চলতে পারে না। তাই এক ফন্দি আঁটল সে। সে চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল, নড়াচড়া বন্ধ হল। চিৎ হয়ে পড়ে রইল বুড়ো বেড়াল। তার এমন হাল দেখে এক ইঁদুর ভাবল—বেড়ালটা বুঝি মরেছে। বাঁচা গেছে । একছুটে সে বন্ধু ইঁদুরদের কাছে গিয়ে বলেছে, খুব খুশির খবর, সেই শয়তান বেড়ালটা এবারে মরেছে। আয় নাচ করি। আয় গান ধরি।

সে খবর শুনে যত নেংটি আর ধেড়ে ইঁদুরের দল বেড়ালটাকে ঘিরে নাচতে লাগল, গাইতে লাগল। বেড়ালটা তবু এতটুকু নড়ল না। একটা ইঁদুর লাফিয়ে বেড়ালের মাথায় চড়ল। বলল, তোরা এখানে আয়, সকলে বেড়ালের মাথায় চড়ে নাচি।

অমনি বেড়ালটা লাফিয়ে উঠে তাকে খপ্ করে ধরে গপ্ করে মুখের ভেতরে চালান করে দিল। বাকি ইঁদুররা যে যেদিকে পারে ছুটে পালাল।

জিভের গল্প বলি

কর্তা একদিন চাকরকে হুকুম করলেন, যা, আমার জন্যে বাজার থেকে আজ সব থেকে সেরা মাংস নিয়ে আয়। চাকর বাজার থেকে একটা জিভ নিয়ে এল।

পরদিন কর্তা চাকরকে হুকুম করলেন, যা, আমার জন্যে বাজার থেকে আজ সবচেয়ে খারাপ মাংস নিয়ে আয়। চাকর বাজার থেকে আবার একটা জিভ নিয়ে এল।

কী ব্যাপার? কর্তা বললেন, তোকে যখন বাজার থেকে সবচেয়ে সেরা মাংস আনতে বললাম, তখন তুই জিভ নিয়ে এলি। ফের, আজ যখন তোকে সবচেয়ে খারাপ মাংস আনতে বললাম, তখনও তুই সেই জিভ নিয়ে এলি। বলি ব্যাপারটা কী?

চাকর বললে, হুজুর, কখনও দেখেছি, জিভে চেটে কোনো খাবারে মানুষ খুব খুশি হয়েছে এমন সুন্দর খাবার কখনও খায়নি বলে। আবার কখনও দেখেছি, জিভে চেটে কোনো খাবার খেয়ে মানুষ খুব চটে গেছে এমন বিশ্রী খাবার কখনও খায়নি বলে। তাই—

কর্তা বললে, ঠিক বলেছিস—জিভ দিয়েই তো আমরা স্বাদ টের পাই, কোন্‌টা স্বাদু। কোন্‌টা বিস্বাদ, তাও জিভে ঠেকিয়েই বুঝি। তুই খুব বুদ্ধিমান। যা, তোর পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলাম।

এক বেড়াল আর তার শক্তিধর বন্ধুরা

এক ছিল বেড়াল। একদিন বসে বসে ভাবছিল সে। ভাবছিল—পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিধর কে? ভেবে ভেবে সে ঠিক করল, পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিধর হল সিংহ। তা, সিংহকে যদি বন্ধু পাই তো খুব ভালো হয়। যাই, সিংহের কাছে যাই আর বন্ধুত্ব পাতাই।

একথা ভেবে বনে গিয়ে সে সিংহের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাল। অনেকদিন তারা বন্ধুও রইল। একদিন দুই বন্ধু বনের মধ্যে হাঁটছিল, পথে দেখা হল এক হাতির সঙ্গে। তাকে দেখে পশুরাজ হাতির দিকে তেড়ে গেল। হাতিও ছাড়বার পাত্র নয়। সে জোর লড়াই শুরু করল আর এক সময়ে কায়দা করে সিংহকে পেড়ে ফেলল।

তা দেখে বেড়ালের ভারি দুঃখ হল। গালে হাত দিয়ে সে ভাবতে বসল—এখন তবে কী করি। ভেবেছিলাম, সিংহ সবচেয়ে শক্তি ধরে, এখন তো দেখি হাতি তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী। তাহলে আমি বরং হাতির কাছে যাই। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই।

তাই সে হাতির কাছে গেল, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাল। অনেকদিন তারা বন্ধুও রইল। একদিন দুই বন্ধু বনের পথে হাঁটছিল, পথে দেখা হল এক শিকারির সঙ্গে। তাকে দেখে হাতি শিকারির দিকে তেড়ে গেল। শিকারি বন্দুকের এক গুলিতে হাতিকে সাবাড় করলে।

তা দেখে বেড়ালের ভারি দুঃখ হল। গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল—এখন তবে কী করি? দেখছি শক্তিধর হাতির চেয়েও মানুষ বেশি শক্তি ধরে। আমি বরং মানুষের কাছে যাই, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই।

সে শিকারির কাছে গিয়ে বলল, আমি কী তোমার সঙ্গে যেতে পারি? শিকারি বললে, কেন পারবে না। চলো, দুজনে প্রথমে বাড়ি যাই।

তাকে নিয়ে শিকারি প্রথমে বাড়িতে এল। সেখানে এসে বেড়াল দেখল, শিকারির বউ তার চেয়েও শক্তি ধরে। কেননা, সে এসে শিকারির বন্দুকটা নিল। শিকারি তাকে বাধা দিল না, আপত্তিও করল না। মুখেও কিছুটি বলল না। বউ চলে গেল রান্নাঘরে।

বেড়াল এবারে কী করে? সে ভেবে ভেবে ঠিক করল, শিকারি বউ-ই শিকারির চেয়ে বেশি শক্তি ধরে। তাই, সে ধীরে ধীরে রান্নাঘরে চলে এল।

এখনও দেখবে, রান্নাঘরে বাড়ির বউ-এর পায়ে পায়ে বেড়াল ঘুরছে।

কুয়োর ভেতরে মুরগি

কেউ কুয়োর কাছে যাবে না, কেউ কুয়োর ধারে খেলবে না। মা-মুরগি হেঁকে বলছিল ছানা মুরগিদের।

সেই থেকে ছানা-মুরগিরা আর কুয়োর দিকে যায় না। কিন্তু একদিন মনের ভুলে এক মুরগির ছানা কুয়োর কাছে গেল। গিয়েই থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—আচ্ছা, মা কুয়োকে এত খারাপ বলে কেন? এই তো আমি, এতক্ষণ হল এসেছি—কোনো গোলমেলে কাণ্ড তো দেখিনি। সব কিছুই তো ঠিকঠাকই রয়েছে। চারিদিক কেমন শান্ত, নিরিবিলি। না, বড়োদের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। যাক, এবারে বরং উঁকি মেরে দেখি কুয়োর ভেতরে কী আছে।

এই ভেবে এক লাফে সে কুয়োর কানায় উঠে বসল। কুয়োর ভেতরে কী আছে, দেখতে হবে তো! উঁকি মেরে কুয়োর ভেতরে দেখে—আরে, সেখানেও তো একটা মুরগির ছানা রয়েছে। ওপরের মুরগিটা মাথা নাড়ল, ওমা, অমনি ভেতরের মুরগিটাও মাথা নাড়াল। সে ওপরে লাফায় তো ভেতরের মুরগিটাও লাফায়। তা দেখে ওপরের মুরগি ছানার খুব রাগ হল। সে ভাবল, ভিতরের মুরগিটার বড্ড বাড় বেড়েছে। ওকে দু-চাপড়ে একটু সমঝে দিই, কার সঙ্গে তামাশা করছে।

এই ভেবে সে কুয়োর ভেতরে ঝাঁপ দিল। কিন্তু তার চাপড় খাবার জন্য কুয়োতে তো অন্য কোনো মুরগি ছানা ছিল না—সে এতক্ষণ কুয়োর জলে নিজেরই ছায়া দেখছিল আর ভাবছিল, অন্য কোনো ছানা তাকে অনুকরণ করছে।

জলে পড়ে তার হুঁস হল। সে চিৎকার করে উঠল—বাঁচাও, বাঁচাও।

সে নিরালা প্রান্তরে কেউ তার ডাক শুনতে পেল না। কুয়োর শীতল জলে তার শরীর ক্রমে নিথর হয়ে এল। আর কোনোদিন কেউ তাকে দেখতে পেল না।

চিলেরা কেন মুরগির ছানা খায়

একবার এক চিলের ছানার ভারি অসুখ হল। সেই ছানার মাসি মা-চিলের কাছে এসে বলল, দিদি, ছোট্কুর খুব অসুখ হয়েছে। ওকে এখুনি ডাক্তার দেখাতে হবে। ছোট্কুর অসুখ সারানোর এক ভালো ডাক্তারের খোঁজ আমি জানি। এ রোগে এ-তল্লাটে মাকড়সার চেয়ে ভালো ডাক্তার আর নেই—ধন্বন্তরি বলতে পারিস। যাই, ওকে আমি ডেকে নিয়ে আসি।

মা-চিল বললে, যা দেরি করিসনি, তাড়াতাড়ি ওকে ডেকে নিয়ে আয়।

মাসি-চিল চলল ডাক্তার ডাকতে। সে মাকড়সাকে গিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু, আমার বোনপোর ভারি অসুখ। দিদির একমাত্তর ছেলে। আপনি দয়া করে একবার দেখবেন চলুন।

বেশ চলো, মাকড়সা বললে, তবে আমার একটু ভয়ও করছে। জানো তো, তোমার দিদি-চিলের বাড়ির কাছেই আছে মুরগিদের এক আস্তানা। তারা ধরে আমায় আবার কপ্ করে খেয়ে নেবে না তো?

না, না, তা কী করে হয়! মাসি-চিল অভয় দেয় মাকড়সা-ডাক্তারকে। আমি থাকতে ওরা কিছুতেই আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

তা শুনে মাকড়সা ওষুধের শিশি-বোতল একটা থলিতে ভরে নিয়ে চলল রোগী দেখতে। চিলের পাড়ায়। মাসি-চিল যতই অভয় দিক, মাকড়সা তো মুরগিদের খুব ভয় পায়। তাই একটা চিঠি লিখে সে তার ওষুধের থলিতে রেখে দিল। তারপরে সে রোগীর বাড়ির দিকে রওনা দিল। মনে ভয় আছে —তাই ধীরে ধীরে যাচ্ছে। তবে সেই একটা কথা আছে না—যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধে হয়। মাকড়সা তখন চিলের বাড়ির কাছ বরাবর পৌঁছেছে কী পৌঁছোয়নি—এমন সময় এক মুরগির সঙ্গে দেখা। তাকে দেখেই সে টুক্ করে এক ঝোপের আড়ালে লুকোলো। কিন্তু মুরগির চোখকে ফাঁকি দেবে কী করে? সে উড়ে এসে খপ্ করে তাকে ধরে কপ্ করে খেয়ে ফেলল।

এদিকে মা-চিল তো মাকড়সা ডাক্তারের জন্যে পথ চেয়ে বসে আছে। কখন সে আসবে। ধন্বন্তরি ডাক্তার ওষুধ দিয়ে ছানা-চিলকে সারিয়ে দেবে।

বসে বসে বেলা ফুরোল, ডাক্তার তো এল না। শেষে সে উড়ে গেল মাকড়সার সন্ধানে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পেল না, তবে মুরগির আস্তানার কাছে পথে পেল তার ওষুধের থলে, আর থলির ভেতর থেকে বেরুল তার চিঠি। চিল-মায়ের উদ্দেশ্যে সেই চিঠিতে লেখা—ছেলেকে দেখতে তোমার বাড়ি যাচ্ছিলাম—সঙ্গে ওষুধপত্র। কিন্তু মুরগি আমায় ধরে খেয়ে ফেলল।

এমনটা হতে পারে ভেবেই মাকড়সা আগেভাগেই চিঠিখানা লিখে রেখেছিল।

তা দেখে মা-চিলের খুব দুঃখ হল। সে অসুস্থ ছানা-চিলের কাছে উড়ে ফিরে এল। বিনা চিকিৎসায় ছানা-চিল মরে গেল।

চিলের ভয়ানক রাগ হল। সে ভাবল, প্রতিশোধ নিতে হবে। মুরগির জন্য আমার ছানা বেচারি বিনা চিকিৎসায় মরে গেল। মুরগির ছানাদের আমি ছাড়ব না।

তাই মুরগির ছানা দেখতে পেলেই চিল আকাশ থেকে নেমে এসে ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে যাবেই।

এখন, যখনই তুমি কোনো মুরগি ধরো, তখনই কঁকর কোঁ বলে সে জানায়—আমি না, আমি না। মানে সে বলতে চায়—আমি মাকড়সা খাইনি—আমি মাকড়সা খাইনি—আমি না...আমি না ।

ব্যাঙের কান্না

এক ছিল ব্যাঙ্, তার ছিল দুই বউ।

এক বউ থাকত ডুমবিতে। অন্য বউ থাকত ডালায়। আর ব্যাঙ্ নিজে থাকত ডুমবি আর ডালার মাঝামাঝি একটি ছোট্ট ডেরায়। সেখান থেকে সে ইচ্ছেমতো ডুমবিতে বা ডালায় যাতায়াত করত, বউদের দেখভাল করত।

চলছিল বেশ। কিন্তু একদিন হল কী—ব্যাঙ্ তো তার ডেরায় বসে আছে, এমন সময়ে সেখানে এক ছোট্ট পুঁচকে ব্যাঙ্ এসে হাজির। এসে বলল, এখুনি ডুমবি চলো, বড়ো বউ ডেকেছে। সে তোমার জন্যে পুডিং বানিয়েছে। গরমাগরম পুডিং খেতে হবে, তাই বড়ো বউ এখুনি ডাকছে।

শুনে তো ব্যাঙ্ খুব খুশি। সে তো পুডিং ভারি ভালোবাসে। তারপরে আবার গরমাগরম পুডিং। এ তো অমৃত! মনের আনন্দে সে ডুমবি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় আরও একটা ছোট্ট পুঁচকে ব্যাঙ এসে হাজির। এসে বলল, এখুনি ডালা চলো। ছোটো বউ ডেকেছে। সে তোমার জন্যে পুডিং বানিয়েছে। গরমাগরম পুডিং খেতে হবে। তাই ছোটো বউ এক্ষুনি ডেকেছে।

ব্যাঙ্ বাবাজি এখন কী করে? সে মাটিতে থেবড়ে বসল। বসে বসে ভাবতে শুরু করল। আমি যদি এখন ডুমবি যাই, তাহলে ছোটো বউ দুঃখ পাবে, আবার চটেও যাবে। আবার পুডিং খেতে যদি ডালায় যাই, তবে বড়ো বউ খুব দুঃখ পাবে, চটেও যাবে।

তা হলে আমি এখন কী করি? কোথায় যাই—ডুমবি না ডালা—কী বিষম জ্বালা!

অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবল। তারপরে কোথাও না গিয়ে ঘরে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদল, কেঁদেই চলল। এখন যে তোমরা মাঝে মাঝে ব্যাঙের ডাক শোনে—গ্যাঙোর গ্যাঙ্ গ্যাঙোর গ্যাঙ্—সেটা কিন্তু আসলে ব্যাঙের কান্না।

কোথায় যাই আমি, কোথায় যাই, কোথায়? কোথায়? কোথায়?

দুটো বউ থাকলে কপালে এমনি দুঃখ জোটে। বিশেষত যখন দুই বউই একই সময়ে চমৎকার পুডিং বানিয়ে ডাক পাঠায়।

খরগোশের কেন ল্যাজ নেই

অনেক অনেক অনেকদিন আগের কথা। জন্তু জানোয়ার কারও কোনো ল্যাজ ছিল না, থাকলেও তা ছিল অ্যাত্তোটুকুন। একদিন বনের রাজা সিংহ সকলকে তার কাছে ডেকে পাঠাল। কেন? না, সকলকে একটা করে চমৎকার ল্যাজ উপহার দেবে। সবাই আনন্দে ল্যাজ আনতে ছুটল, শুধু খরগোশ গেল না। কারণ দিনটা ছিল ভারি ঠান্ডা। আর বেশ বৃষ্টিও পড়ছিল। যদিও খরগোশের ছোট্টো অ্যাত্তোটুকুন একটা ল্যাজ ছিল, তবু একখানা মস্ত ল্যাজ পেলে সে খুশি হত। তবু এই ঠান্ডায় অলস খরগোশের বাসা ছেড়ে যেতে একটুও ইচ্ছে করছিল না, তাই বন্ধুদের অনুরোধ করল, আমার জন্যে ভাই একটা ল্যাজ চেয়ে আনিস। এই বৃষ্টিতে ভিজে আমি যেতে পারব না।

কেমন ল্যাজ চাস তুই?—ওরা জিজ্ঞেস করল।

একখানা সুন্দর ল্যাজ চাই। না, খুব লম্বা নয়, আবার ছোট্টোও নয়। মাঝারি মাপের, সুন্দর দেখতে হয় যেন।

খানিকবাদে সবাই ফিরে এল। সবারই জুটেছে চমৎকার ল্যাজ—যার যেমন পছন্দ। তবে খরগোশের জন্যে কেউ কোনো ল্যাজ আনেনি।

মনে হয়, ওদের মধ্যে কেউ কেউ অত সুন্দর সব ল্যাজ দেখে খরগোশের কথা ভুলে মেরেছিল, কারও কারও হয়তো মনে ছিল, কিন্তু ওর ল্যাজ খোঁজার সময় তাদের ছিল না, আবার কেউ কেউ হয়তো খুঁজেছিল, কিন্তু খরগোশের মনের মতো ল্যাজ পায়নি। তাই বলি, যদি তুমি কিছু করতে চাও তো নিজেই করো। অন্য কাউকে সেটা করে দেবার জন্যে অনুরোধ করো না। ল্যাজ নিয়ে খরগোশের বিপত্তির কথা কখনও ভুলো না।

ঠিক হিসেব

একদিন একপাল কুকুর শিকার ধরতে বেরুল। দলে ছিল ন'টি কুকুর। পথে এক সিংহের সঙ্গে দেখা। সে বলল, কোথায় যাচ্ছ সব দল বেঁধে? ওরা বলল, শিকার ধরতে। সিংহ বললে, ভালো কথা, আমিও তো শিকার ধরতে যাচ্ছি, চলো এক সঙ্গে যাওয়া যাক।

এবারে তারা সবাই মিলে মোট দশটা হরিণ শিকার করল।

শিকার পর্ব শেষ হলে সিংহ বলল, এখন তাহলে মাংস ভাগ করে ফেলা যাক।

কুকুরদের মধ্যে একজন চটপট বলে ফেলল, তা করাই যেতে পারে, আর হিসেবটা তো খুবই সহজ। আমরা নয় আর আপনি এক, মোট দশজন। হরিণও ধরা পড়েছে দশটা। প্রত্যেকে একটা করে পাব। শুনে সিংহ খুব রেগে গেল। সে হিসেব-কষা কুকুরের মুখে মারল এক থাবা। সঙ্গে সঙ্গে তার দুটো চোখ অন্ধ হয়ে গেল।

তা দেখে বাকি কুকুরেরা আর রা কাড়ে না। সবাই চুপ। শেষে একটি কুকুর ধীরে ধীরে বলল, আমি বলছি, আপনি ঠিকই করেছেন, আমার বন্ধুটি ভুল ভাগ করেছিল। ভাগাভাগিটা কীভাবে হবে, আমি বলে দিচ্ছি। রাজামশাই একজন, তাঁর ভাগে যাবে ন'টা হরিণ, মানে রাজা আর হরিণ মিলে হল দশ। আবার আমরা হলাম নয়জন, আর বাকি একটা হরিণ আমাদের ভাগে এলে আমরাও হব দশ। বলুন, ঠিক ভাগ হল কি না?

এই ভাগ সিংহের খুব পছন্দ হল। সে বললে, তোমার মাথাটা তো খুব সাফ্। এমন চমৎকার ভাগ করা, কে শেখালে তোমায়?

কুকুরটি বলল, আপনি আমাদের হিসেব—কষা ভাইকে এক চড়ে অন্ধ করে দিয়েছেন। সেই ভাই-ই আমায় এমন হিসেব শিখিয়েছে, মহারাজ।

কুকুর আর মুরগি কেন গৃহপালিত হল

অনেক অনেক অনেককাল আগের কথা। তখন পাখিদের মতো কিছু জানোয়ারও আকাশে থাকত। তাদের মধ্যে কুকুর আর মুরগিও ছিল। তখনকার কথা।

একদিন খুব ঠান্ডা পড়েছিল। সারাদিন ধরে বৃষ্টি ঝরছিল।

আকাশের পাখিরা কুকুরকে বলল, যাও ভাই, নীচে নেমে পৃথিবী থেকে খানিক আগুন নিয়ে এসো। ঠান্ডায় আমাদের হাত-পা জমে যাচ্ছে দেখছ তো। আগুন আনলে আকাশ গরম করে ফেলা যাবে।

কুকুর তো পৃথিবীতে নেমে এল। এসে সে হাজির হল একজন মানুষের বাড়ি। বাড়ির পাশে কতক হাড় পড়েছিল। হাড়ের গায়ে সামান্য মাংসও লেগেছিল। কুকুর প্রাণ ভরে সেই হাড় চিবোতে লাগল আর আকাশের কথা, আগুন নিয়ে ফেরার কথা—সব ভুলে গেল।

আকাশে পাখির দল আগুনের আশায় কুকুরের ভরসায় অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে। আর কুকুর তো সেসব ভুলে মানুষের সঙ্গে পৃথিবীতে থাকবে বলে ঠিক করে ফেলেছে।

কিন্তু আকাশে আগুন তো চাই, সেখানে এখনও ভয়ংকর ঠান্ডা। পাখিরা এবারে মুরগিকে ধরল। দ্যাখ, কী ঠান্ডা পড়েছে! কুকুরকে পাঠালাম আগুন আনতে। সে তো ফিরল না। তুই ভাই পৃথিবী থেকে আগুন এনে আমাদের বাঁচা।

মুরগি তো পৃথিবীতে নেমে এল। এসে সে হাজির হল একজন মানুষের বাড়ি। বাড়ির পাশে ছড়ানো শস্যের দানা। শস্যের দানা পেয়ে টুকটুক সে করে খেতে লাগল। এমন পছন্দের দানা পেয়ে আকাশের কথা, আগুন নিয়ে ফেরার কথা সব ভুলে গেল। সে-ও পৃথিবীতেই থাকবে বলে ঠিক করল। আকাশের সবাই ঠান্ডায় আরও কষ্ট পেতে থাকল। এজন্যে পাখি বা পশুরা স্বার্থপর কুকুর ও মুরগিকে একদম পছন্দ করে না।

এখন জানলে তো; কুকুর আর মুরগি কী করে গৃহপালিত হয়ে গেল।

কেন গিরগিটি মাথা নাড়ে!

অনেক অনেক অনেককাল আগের কথা। তখন কুকুর আর গিরগিটির ছিল গলায় গলায় ভাব। তবে কুকুর মাঝে মাঝে মানুষের সঙ্গেও হাঁটতে বেরুত।

একদিন গিরগিটি কুকুরকে শুধোল, আচ্ছা, তুমি মাঝে মাঝে ওই মানুষটার সঙ্গে যাও কেন?

আমরা দুজনে বন্ধু। কুকুর উত্তর দিল। বলল, জানো, লোকটা একজন শিকারি, আমরা দুজনে একসঙ্গে শিকারে যাই। শিকারেও সাহায্য করি। যা শিকার জোটে, আমরা ভাগ করে খাই।

একদিন ওরা শিকারে গিয়ে একটা হরিণ মারল। তারপরে কুকুর সেটা বয়ে নিয়ে গেল শিকারির বাড়িতে।

তাদের দেখে গিরগিটিও তাদের পিছু নিল। এবারে শিকারি হরিণের মাংস রেঁধে বেড়ে নিজেই খেতে শুরু করল। এমন সময় কুকুরটা এসে কিছুটা মাংস খেতে চাইল। তা শুনে লোকটা খেপে গিয়ে মস্ত এক লাঠি নিয়ে তার মাথায় লাগাল জবর এক ঘা। লাঠির ঘা খেয়ে কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালাল।

গিরগিটি তো ওদের পিছু পিছু আসছিল। সব কিছুই ঘটল তার চোখের সামনে। ভয়ে সে ছুট্ লাগাল। ছুটতে ছুটতে একেবারে বনের মাঝে এসে থামল। আর তখন থেকেই মাথা নাড়া শুরু হল তার।

ইয়াংগু, ইয়াংগু, ইয়াংগু—খারাপ, খুব খারাপ, খুব খারাপ। কেন কুকুর বলল যে, ও শিকারির বন্ধু! সে ওকে শিকারে সাহায্য করে আর মাংস ভাগ করে খায়? বেচারি কুকুরকে অমন করে লাঠিপেটা করা! না, মানুষটা একটুও ভালো নয়। অতি বদ লোক। আমি আর কখনও মানুষের ধারে কাছে যাব না, আমি এই বনেই থাকব।

তাই গিরগিটি বনেই থাকে। মানুষের চৌহদ্দিতে আসে না। যখনই কুকুরকে মারার কথা মনে পড়ে তার তখন মাথা নাড়া শুরু হয়, ইয়াংগু ইয়াংগু ইয়াংগু, খারাপ, খুব খারাপ, খুব খারাপ...।

কেন বাজপাখি ছোঁ মেরে মুরগি ধরে

একদিন সূর্যি ঠাকুর এসে বাজপাখিকে বললেন, আমার কিছু টাকার দরকার, ভাই। টাকাটা এখনই দাও। তোমায় শিগগিরিই ফিরিয়ে দেব।

তা শুনে বাজপাখি গুণে গুণে টাকাটা এনে তাকে দিল বাড়ি থেকে।

তারপরে হপ্তা পার হয়ে গেল, মাস পার হয়ে গেল—টাকা আর ফেরত এল না। শেষে বাজ মনে মনে ঠিক করে ফেলল—না, অনেক হয়েছে —এবারে সূর্যি ঠাকুরের কাছে গিয়ে টাকা ফেরত চাইতে হবে।

একদিন সে সত্যিই সূর্যের কাছে গেল টাকা চাইতে। তখন বেশ বেলা হয়েছে, সূর্যদেব আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছেন। বাজ হেঁকে বলল, ঠাকুর, তোমার কী মনে পড়ে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলে। শিগগির ফেরত দেবেও বলেছিলে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব মনে আছে। কিন্তু এখন তো ভাই, অনেক ওপরে উঠে এসেছি। সঙ্গে করে টাকা আনিনি, টাকা বাড়িতে আছে। তা, আমি যখন বাড়িতে থাকি, তখন এলে তোমার টাকা নিশ্চয় ফেরত দিয়ে দেব।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমায় বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করো না—বাজ বলল। আর ঠিক করল, পরের দিন সকালেই সূর্যের বাড়ি যাবে। কিন্তু সেদিন তার ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হল, সূর্য ততক্ষণে আকাশ পথে পাড়ি জমিয়েছে।

তারপরে একদিন সে সূর্যের বাড়ি গেল। সেদিন সূর্য বাড়ি ছিল না, কোথায় যেন বেরিয়েছিল। তারপরে বাজ আবার গেল, আবার গেল, বারবার গেল কিন্তু কোনোবার তার দেখা মিলল না।

এমনি এক সকালে বাজ যাচ্ছিল সূর্যের বাড়ি, পথে এক মোরগের সঙ্গে দেখা। সে বলল, বাজ ভাই, রোজই তো দেখি সূর্যি ঠাকুরের বাড়ি যাও। কারণটা কী?

বাজ বলল, অনেকদিন আগে সূর্যি ঠাকুর আমার কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যে শোধ দেবার কথা তার। কিন্তু দেয়নি। ঠাকুর বলেছিল, যখন আকাশে থাকি, তখন তো আর টাকা দেওয়া যায় না। তুমি বরং বাড়িতে এসো। তাই বাড়িতে যাই। তবু দেখা পাই নে।

মোরগ বলল, ভাবনা কী, আমি তো আছি! তুমি বরং আজ রাত্তিরটা আমার বাড়ি থেকে যাও। সূর্যি ঠাকুর ওঠার অনেক আগেই তো আমি উঠে পড়ি। আমি তোমায় কাল ভোর রাতে ডেকে দেব। তাহলে তুমি সুর্যি ঠাকুরকে বাড়িতেই ধরতে পারবে। তোমার টাকারও একটা হিল্লে হবে।

সে রাত্রে বাজপাখি রয়ে গেল মোরগের বাড়িতে। ভোর রাতে মোরগ কোঁকর কোঁকর কোঁ হেঁকে বললে, উঠে পড়ো। উঠে এবারে ছোটো সূর্যি ঠাকুরের বাড়ি। এখনই গিয়ে তাকে ধরো। এখন তাকে বাড়িতেই পাবে।

মোরগকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাজপাখি চটপট সূর্যের বাড়ির পথ ধরল। তার বাড়ি পৌঁছে দেখা গেল, সূর্যদেব কখনও বিছানা ছাড়েননি।

সুপ্রভাত সূর্যি ঠাকুর, বাজ বললে, এবারে উঠে পড়ো। তোমার ওঠার সময় হয়েছে, আর আমার টাকাটা ফেরত দাও। আমিও বাড়ি ফিরি।

সুপ্রভাত বাজপাখি। তা এত সকালে আমার বাড়ি আসার পরামর্শ কে দিয়েছে তোমায়?

এ কথার জবাব না দিয়ে বাজ চুপ করে রইল।

সূর্য আবার জিজ্ঞেস করলেন, বলো, এত সকালে আমার বাড়িতে আসবার পরামর্শ তোমায় কে দিয়েছে? যদি তুমি তার নাম না বলো তা হলে তোমার টাকাও ফেরত পাবে না।

এবারে বাজ আর কী করে? সত্যি কথাটাই বলে ফেলল। তা শুনে সূর্যদেব ভয়ংকর চটে গেলেন। ও, মোরগ এই বুদ্ধি দিয়েছে। তবে তো ওকেই দাম দিতে হবে। ওর সব ছানাই তোমার হবে—তুমি ছোঁ মেরে তা তুলে নেবে। এটাই আমার কথা।

কী আর করে বাজ? সেদিন থেকেই মুরগির ছানার দেখা পেলেই ছোঁ মেরে তুলে নেয়।

ঠগের কেরামতি

একজন লোক ভেড়া কিনে বাড়ি ফিরছিল। পথে এক ঠগের সঙ্গে দেখা। ভেড়াটাকে দেখে ঠগের চোখ লোভে চকচক করে উঠল। ও! কী সুন্দর ভেড়া। নরম ঘন লোমে ঢাকা নাদুসনুদুস ভেড়া। নাঃ, এ ভেড়া আমায় হাতাতেই হবে—ভাবল ঠগ। তারপরে সে অন্যপথে দৌড়ে ওদের থেকে খানিক এগিয়ে এসে বাঁ পায়ের জুতো-পাটি খুলে পথের পরে রেখে পাশের এক ঝোপে লুকিয়ে পড়ল।

ভেড়া কিনে মানুষটা মনের আনন্দে পথ চলছিল। হঠাৎ পথের পরে এক পাটি নতুন জুতো দেখে অবাক হল। হাতে নিয়ে দেখল, বাঃ চমৎকার জুতো। কিন্তু এক পাটিতে কী হবে? একটু নেড়ে চেড়ে তা ফেলে রেখে সে নিজের পথেই এগিয়ে চলল।

ঠগ আড়াল থেকে সব দেখল। ওরা খানিক এগিয়ে যেতে সে জুতোর বাঁ পাটি পায়ে গলিয়ে ছুট লাগালো। অন্য পথে সে ভেড়াওলা লোকটির থেকে বেশ খানিক এগিয়ে এবারে ডান পায়ের জুতো পাটি পথের পরে রেখে পাশের এক ঝোপে লুকিয়ে রইল।

একটু পরে ভেড়ার দড়ি ধরে লোকটা সেখানে হাজির। আরে! এখানে তো দেখছি ডান পাটি পড়ে রয়েছে। এ জোড়ার বাঁ-পাটি আগেই ছেড়ে এসেছি। তা হলে যাই, সেটা নিয়ে আসি। দু-পাটি পেলে এক জোড়া দামি জুতো জুটে যাবে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ! একথা ভেবে সে ভেড়াটা এক গাছের ডালে বেঁধে বাঁ-পাটি জুতো খুঁজতে গেল।

অনেক খুঁজেও সে বাঁ পাটি জুতোর খোঁজ পেল না। রোদের পথে অনেক হাঁটা হয়েছে। দেরিও হয়ে গেছে বেশ। বড়ো ক্লান্ত বোধ করছিল লোকটা। আবার বাড়ি ফিরে কত কাজ রয়েছে। যাই, ভেড়াটা নিয়ে ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরি।

ফিরে এসে দ্যাখে, আরে—ডান পাটির জুতোটাও নেই। আবার গাছের ডালে বাঁধা ভেড়াটাও গায়েব।

তা তো হবেই। সে চলে যেতেই ডান পাটির জুতো পায়ে গলিয়ে ঠগ অনেকক্ষণ আগে গাছের ডাল থেকে দড়ি খুলে ভেড়া নিয়ে চলে গেছে।

ভেড়া হারিয়ে লোকটা বুঝল, সে কী বোকা! জুতোও পেল না, ভেড়াও হারাল।

কুমির কেন মুরগি খায় না

এক মুরগি রোজ নদীতে জল খেতে আসে।

এমন মিষ্টি নদীর জল, সে প্রাণ ভরে খায়। সেই নদীর এক কুমির একদিন তাকে দেখতে পেল। ইচ্ছে হল তাকে টুক্ করে খেয়ে ফেলে। যখন হাঁ করে মুরগিটাকে খেতে যাচ্ছে সে, তখনই মুরগি চেঁচিয়ে উঠল, দোহাই, আমায় খেও না কুমির ভাই।

মুরগি তাকে ভাই বলে ডেকেছে, এখন কুমির আর তার বোনকে খায় কী করে? সেদিন তাকে রেহাই দিল। মুরগি জল খেয়ে চলে গেল।

পরদিন মুরগি ফের নদীতে এল, জল খেতে হবে তো! তাছাড়া এমন মিষ্টি জল এখানে ছাড়া কোথায় পাবে সে। এদিকে কুমিরটা ঠিক করেছে, আজ আর কোনো কথা নয়, মুরগিটা সে খাবেই।

আবার মুরগিও তার মতলব বুঝে কেঁদে কেঁদে বলল। দোহাই, আমায় খেও না কুমির ভাই। সেদিনও কুমির তাকে রেহাই দিল। রেহাই দিয়েই কুমির এবার ভাবতে বসল। আচ্ছা, আমি কী করে ওর ভাই হব। আমি তো জলে বাস করি আর মুরগি থাকে ডাঙায়। তাহলে... তাহলে—ভাবতে ভাবতে কুমির এক টিকটিকির কাছে গেল। তাকে বলল, বন্ধু, আমি এক সমস্যায় পড়েছি। আমাদের নদীতে এক মোটাসোটা মুরগি রোজ জল খেতে আসে। আমারও ওকে খেতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু ও আমায় ভাই বলে ডেকেছে। তাই ওকে খেতে পারি না। তবে ও তো আমার কেউ নয়। আমি থাকি জলে ও থাকে ডাঙায়। আমরা ভাই-বোন হই কী করে?

টিকটিকি বলল, ও তো ঠিক কথাই বলেছে। ও ডিম পাড়ে, তুমিও ডিম পাড়ো। কচ্ছপ ডিম পাড়ে, টিকটিকিও ডিম পাড়ে। তাহলে আমরা সবাই হলাম ভাই-বোন। এবারে বুঝতে পারলে নিশ্চয়।

তাই তো! ঠিক কথাই বলেছ তো, বলল কুমির।

এখন তোমরাও নিশ্চয় বুঝতে পারলে, কেন কুমির মুরগি খায় না।

সিংহের নৈশভোজ

সাভানার তৃণভূমি মানে মস্ত ঘাসের জমি। যতদূর চোখ যায়, শুধু ঘাস আর ঘাস। এই ঘাসের জমিই ছিল জানোয়ারদের প্রিয় জায়গা। তার মধ্যে ছিল মিষ্টি জলের পুকুর আর কচি সবুজ ঘাস। সেখানে থাকত এক সিংহ—বেজায় শক্তিধর। রোজই সে দু তিনটে জানোয়ার মারত। অনেকটাই অকারণ, সবটুকু সে খেত না বেশিটাই পড়ে থাকত। তা দেখে শেষে বনের পশুরা জোট বেঁধে তার কাছে এল। বলল, মহারাজ, আপনি সারা বন ঘুরে শিকার ধরেন, আপনার খুব পরিশ্রম হয়। আমাদের রাজা আপনি। আপনার এত ধকল নেওয়া উচিত নয়। আমরা বরং রোজ আপনার জন্য একটি করে পশু পাঠাব, আপনাকে আর ছুটোছুটি করতে হবে না। আপনি ঘরে বসেই শিকার পেয়ে যাবেন—তাতেই আপনার কাজও হবে—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

তা বেশ, ওদের কথায় সিংহ রাজি হল। তাহলে আজ থেকেই তোমাদের ভেট পাঠানো শুরু করো। আজকের ভোজটা তা দিয়ে সারা যাক। এখন দেখছি খিদেটাও বেশ জমেছে। আর একটা কথা গোড়াতেই তোমাদের সাফ সাফ বলে দিই। আমায় কিন্তু রোজই আস্ত একটা জানোয়ার পাঠাতে হবে। যদি কোনোদিন খাবার পাঠাতে ভুল হয়, তাহলে সেদিন কিন্তু তোমাদের যতজনকে পারব, এক্কেবারে সাবাড় করব, কোনো বাহানা শুনব না।

সে কথাতেও ওরা রাজি হল। সেদিন একটা হরিণ পেয়ে রাজামশাই নৈশাহার সাঙ্গ করলেন। তারপর থেকে ওরা একটি করে পশু ভেট পাঠাতে লাগল নিয়ম করে। কোনোদিনও বাদ পড়ল না।

এ ব্যবস্থা চলছিল ঠিকই, কিন্তু পশুদের মনে আর আনন্দ রইল না। রোজই ভয় হয়—আজই বুঝি আমার পালা—মানে জীবনের শেষ দিন। আজই সে সিংহের নৈশভোজের আহার হবে।

একদিন এক খরগোশের পালা এল। সে কিন্তু একটুও অখুশি হল না। মুচকি হেসে সে বলল, ভালো, বেশ ভালোই হল। শোনো, তোমরা একটুও ভয় পেওয়া না, সিংহ কিন্তু আমায় খেতে পাবে না। আমি ঠিক ফিরে আসব।

সিংহের কাছে যাবার পথে খরগোশ নদীতে ক'টা ডুব দিয়ে নদী তীরের কাদায় ক'বার গড়াগড়ি খেয়ে গায়ে প্রচুর ধুলো কাদা মেখে সোজা সিংহের কাছে হাজির হল।

তাকে দেখে তো সিংহ গেল খুব রেগে। এত দেরি করে এলি? তাছাড়া এমন নোংরা জানোয়ারে আমার রাতের-খাবার হয় না কি?

সে বললে, রাজামশাই, আমি তো আপনার রাতের খাবার নই। রাতের খাবার তো ছিল পেল্লায় এক খরগোশ। তাকে নিয়েই তো আসছিলাম। তা আসার পথে আরেকটা সিংহের সঙ্গে দেখা। সে ওই খরগোশটা কেড়ে তার জন্যে রেখে দিল। সেই কথা বলতেই তো এলাম আপনার কাছে।

কী বলছিস—আমাদের সাভানার জঙ্গলে আরও একটা সিংহ!

হ্যাঁ মহারাজ, সেটা আবার যেমন বড়ো, গায়েও তেমনি বেজায় জোর। আমার মনে হয় সে আপনাকে মেরে ফেলবে।

সেকথা শুনে রাগে সিংহের শরীর জ্বলতে লাগল। তুই, তুই ওই সিংহটাকে আমায় দেখাতে পারবি?

কেন পারব না, চলুন যাই। বলে খরগোশ সিংহকে একটা মস্ত বড়ো কুয়োর ধারে নিয়ে এল। কুয়োটা যেমন বড়ো, তেমনি গভীর। সেই কুয়োর পাড়ে এসে বলল, দেখুন, সিংহটা এখানে আছে, সঙ্গে খরগোশটাও।

সিংহটা এক ছুটে সেখানে এসে কুয়োর ভেতরে চেয়ে দেখে, ঠিকই তো, সেখানে একটা সিংহ রয়েছে, পাশে খরগোশটাও।

দেখি তো, কেমন শক্তিধর সিংহ, বলে রাগে জ্বলতে জ্বলতে সিংহ কুয়োর ভেতরে দিল এক লাফ। তার অত ভারী শরীর কুয়োর গভীর জলে তলিয়ে গেল।

আসলে সেখানে কোনো সিংহ ছিল না। বনের সিংহ কুয়োর জলে নিজের ছায়া দেখেছিল, সঙ্গী খরগোশকে দেখে ভেবেছিল আরেকটা খরগোশ।

পশুদের কাছে সে খবর পৌঁছোলে সেখানে মহা উৎসব শুরু হল। সেই উৎসবের প্রধান পুরোহিত অবশ্যই সেই বুদ্ধিমান খরগোশ।

কুকুর কেন মানুষের বন্ধু

অনেক অনেক অনেককাল আগের কথা। শেয়াল আর কুকুরে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। তারা থাকত একসঙ্গে, একই জঙ্গলে। একই সঙ্গে তারা শিকারে বেরুত, শিকার ধরত। সাঁঝের বেলা শিকার নিয়ে ডেরায় ফিরত। রাতের খাবারের পাট সারত একই সঙ্গে।

সেদিন তাদের বরাত ছিল মন্দ। সারাদিন অনেক চেষ্টা করেও তারা একটাও শিকার ধরতে পারল না। শ্রান্ত, ক্লান্ত শরীরে এক পেট খিদে নিয়ে সাঁঝবেলায় ঘরে ফিরল। তখন প্রচণ্ড ঠান্ডায় তারা জমে যাবার জোগাড়।

কুকুর বললে, ওঃ, যা শীত পড়েছে না! আবার পেটেও ছুঁচোয় ডন মারছে। এর চেয়ে খারাপ অবস্থা ভাবাই যায় না। আর বকবক করো না, শেয়াল বললে, যাও, শুয়ে পড়ো। কাল সকালে শিকারে যাব, একটা হরিণ জুটিয়ে ফেলবই। কুকুরের চোখে আর ঘুম আসে না। শুয়ে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে দূরে একটা লাল আলোর রেখা দেখতে পেল। ধড়মড়িয়ে উঠে সে শেয়ালকে জিজ্ঞেস করল, দূরে ওই যে লাল আলো দেখা যাচ্ছে, ওটা কী?

ওখানে মানুষের একটা গাঁ আছে। ওখানে ওরা আগুন জ্বেলেছে, তারই লাল আলো দেখছ। নাও, শুয়ে পড়ো। বলল শেয়াল।

কুকুর বলল, আগুন! আগুন হলে তো গরম হবে। ওঃ, এই শীতে একটু আগুন পোয়াতে পারলে বাঁচতাম। শেয়াল, তুমি তো মস্ত বীর, যাও না বাপু, খানিকটা আগুন নিয়ে এসো।

না, না আমি যাব না। শেয়াল সাফ জবাব দিল, ইচ্ছে হয় তো তুমি যাও।

কুকুর একলা যেতে চাইছিল না। মানুষকে তার ভারি ভয়। খানিক ভেবে সে দেখল, শেয়াল যেতে চাইছে না। একলা গেলে আরেকটা লাভ হতে পারে। আগুনের আশেপাশে কিছু হাড়ও পাওয়া যেতে পারে। মাংস খেয়ে মানুষেরা হাড় ফেলে দেয়। তা পেলে তো বাড়তি লাভ—পেটটা ভরবে, শরীরও গরম হবে।

কুকুরের ভীষণ খিদে পেয়েছিল। শীতেও বড়ো কষ্ট হচ্ছিল, তাই মানুষের ভয় ভুলে ওই গাঁয়ের দিকে সে রওনা দিল। যাওয়ার সময় বলল, শেয়াল ভাই, আমি ওই গাঁয়েই চললাম। আগুনের ওম তো পাবই, সঙ্গে মাংসের হাড়ও পেতে পারি। আমার ফিরতে যদি দেরি হয় তো হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া বলে আওয়াজ করিস। সে শব্দ শুনে আমি বুঝব, তুই কোথায় আছিস। আমি সোজা চলে আসব।

একথা বলে কুকুর তো গাঁয়ে গেল। সেখানে আগুনের পাশেই ছিল এক গেরস্তের বাড়ি। বাড়ির পাশে কয়েকটা টুকরো হাড় পড়েছিল, তা দেখে খুশি মনে কুকুর সেদিকে এগোচ্ছিল, এমন সময় বাড়ির দরজা খুলে একজন বেরিয়ে এল। তা দেখে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে কুকুর বলল, দোহাই আমায় মারবেন না, মারবেন না। আমি অধম কুকুর। এই শীতে বড়ো কাহিল হয়ে পড়েছি—তাই একটু আগুন পোয়াতে এসেছি। শরীর একটু গরম হলেই চলে যাব।

লোকটি বললে, ঠিক আছে, তুমি তাহলে আগুনের কাছে এসে বসো। গা গরম হলে চলে যেও।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কুকুর আগুনের কাছে গিয়ে বসল। অল্পক্ষণেই তার শরীর গরম হয়ে গেল। তারপরে যেখানে হাড়ের টুকরো ছিল, সেখানে গিয়ে পরম সুখে তা চিবোতে শুরু করল। ঠিক তখনই লোকটা দোর খুলে ফের বাইরে এল। কুকুরকে দেখে বললে, কী ব্যাপার, এখনও তোমার গা গরম হল না?

কুকুর বলল, না, এখনও ঠিকমতো হয়নি। তার নাগাল থেকে সামান্য দূরে আরও কটা হাড় পড়েছিল। সেটাও খাবে বলে সে ভেবেছিল।

একটু পরে লোকটা আবার ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, কী এখনও তোমার গা গরম হল না?

কুকুর বলল, না, আমায় আর একটু থাকতে দিন। এখনও ঠিকমতো গরম হতে পারিনি।

তা শুনে লোকটার মনে একটু সন্দেহ দেখা দিল, সে কুকুরটার কাছে এগিয়ে এল।

তার চোখের দিকে চেয়ে কুকুর শেষে বলেই ফেলল, হ্যাঁ, আমার গা গরম হয়েছে ঠিকই, তবে আমি আর আমার পুরোনো আস্তানায় ফিরে যেতে চাই না। ওখানে খিদে-ঠান্ডায় বড়োই কষ্ট পাই, আপনাদের গাঁয়ে থাকতে পেলে বেঁচে যাই। দয়া করে আমায় এখানে থাকতে দিন। আপনাদের পাখি শিকারে আমি সঙ্গী হব, ঝোপে-জঙ্গলে জানোয়ার শিকারে সাহায্য করব। সামান্য হাড় পেলেই আমার খাওয়ার প্রয়োজন মিটবে।

ঠিক আছে, তাই হবে। লোকটি বলল, ইচ্ছে হলে তুমি আমাদের এখানে থেকে যেতে পারো।

সেদিন থেকেই কুকুর মানুষের কাছে থাকে। তোমরা যে শেয়ালের 'হুক্কা হুয়া' ডাক শোনো, তা আসলে কুকুরকে জানান দেওয়া—সে এখন কোথায় আছে। কুকুর সে ডাক শোনে, কিন্তু সাড়া দেয় না। তাই শেয়াল ঝোপে একাই থাকে। কুকুর থাকে মানুষের কাছে।

চাঁদ-সূর্য কেন আকাশে থাকে

অনেক অনেক অনেককাল আগের কথা। তখন চাঁদ-সূর্য সবাই পৃথিবীতে থাকত। জল ছিল তাদের প্রিয় বন্ধু। তারা প্রায়ই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু বন্ধু কখনও তাদের বাড়ি আসে না।

একদিন চাঁদ সূর্য অভিমান ভরে জলের কাছে অনুযোগ জানাল—ভাই, তোমার ওখানে আমরা কতবার গেলাম, কিন্তু তুমি ভাই একটিবারও আমাদের বাড়ি এলে না।

জল বলল, সাধে কী যাইনে ভাই, আমার তো অনেক বন্ধু। তারা সবাই গেলে তোমাদের ঘরে জায়গা কুলোবে না।

সূর্য বলল, ঠিক আছে, তোমার বন্ধুদের নিয়ে যাতে আসতে পারো, তেমন বাড়ি আমরা বানিয়ে ফেলছি, তখন কিন্তু আসতে হবে। জল হেসে বলল, বেশ।

এবারে চাঁদ সূর্য মিলে এক পেল্লায় বাড়ি বানিয়ে ফেলল—পাঁচ-ছয়তলা উঁচু, অনেকগুলো ঘর, পৃথিবীতে অতবড়ো বাড়ি আর নেই। তারপর জলকে সবান্ধবে নেমন্তন্ন করল।

নেমন্তন্নর দিনে জল তো এলই সঙ্গে জলচর তার বন্ধুর দল।

এসেই জল হাঁকল, চন্দ্র-সূর্য। দ্যাখো আমরা এসে গেছি।

সূর্য বলল, আসবেই তো—তা বাইরে কেন, ঘরে এসো। সবাই এসো।

অমনি হুড়মুড় করে ঘরে জল ঢুকল, তার সঙ্গে জলচরেরা। হাজার রকমের মাছ, হাঙর, কুমির, এমনকি তিমি পর্যন্ত। মুহূর্তে একতলা জলে ভরে গেল। চাঁদ-সূর্যের মাথা পর্যন্ত ডুবে গেল—ওরা দোতলায় উঠল। একটু পরে দোতলাও ডুবল, ওরা চারতলায় উঠে গেল। তাতেও কী তাদের নিস্তার আছে! চারতলাও জলে ডুবে গেল। চাঁদ-সূর্য তখন টুপ্ করে আকাশে উঠে গেল—সেখানে আর জল পৌঁছোতে পারে না।

আকাশে থাকতে তাদের ভালোই লেগে গেল। তখন থেকেই ওরা আকাশের বাসিন্দা।

মহাভোজ

একবার গাঁও-বুড়ো ঠিক করল, ওদের এলাকার সব কটি গাঁয়ের বাসিন্দাদের নিয়ে এক ভোজের আয়োজন করবে। মহাভোজ হবে। গাঁয়ে গাঁয়ে খবর পাঠিয়ে সব গাঁয়ের বাসিন্দাদের ডেকে নিল সে। সবাই এলে গাঁও-বুড়ো বললে, 'শোনো, এবারে যে ভোজের ব্যবস্থা করেছি, তাতে সব কিছু আমিই করব, শুধু ভোজ শুরুর আগে যে শরবত খেতে হয়, তার জোগাড় তোমরা করবে। প্রত্যেক পরিবার এক ভাঁড় করে, খাঁটি শরবত আনবে, ভোজ বাড়ির সামনে একটা জালা থাকবে, তাতে তোমাদের আনা শরবত ঢেলে দিও। খেয়াল রেখো, শরবত খাঁটি হলেই কিন্তু মহাভোজ জমবে ঠিক।'

ভোজের দিন এসে গেল। ছেলে-বউ নিয়ে ঝলমলে পোশাক পরে সকলে গাঁও-বুড়োর বাড়ির পথ ধরল। সেখানে পৌঁছে সকলে বুড়োর কথা মতো সেই ভোজবাড়ির সামনে রাখা জালায় এক ভাঁড় শরবত ঢেলে দিচ্ছিল। ক্রমে সে জালা ভরে উঠল।

বুরু-রও সেই ভোজবাড়িতে যাবার খুব সাধ। কিন্তু তার বাড়িতে এক ফোঁটাও শরবত ছিল না। তার বউ বলল, বাড়িতে নেই তো কী, দোকান থেকে তৈরি শরবত কিনে নিলেই তো সমস্যা মেটে। তা শুনে লোকটা আপত্তি করে, বলছ কী? শরবত আমি কিনে নেব? না, না, আমি খাঁটি শরবত কিনতে পারব না। বরং একটা বুদ্ধি করি।

আমি এক বোতল কুয়োর জল নিয়ে যাই। হাজার হাজার বোতল খাঁটি শরবতের মধ্যে এক বোতল কুযো র জল মিশলে কেউ বুঝতে পারবে না, স্বাদেরও কোনো তফাত হবে না।

ঝলমলে পোশাক পবে, সে-ও বউ ছেলেকে নিয়ে ভোজবাড়িতে হাজির হল। শরবতের জালায় তার ভাঁড়ের জল ঢেলে নিমন্ত্রিতদের দলে ভিড়ে গেল।

এবারে খাবার পালা। সবাই পাত পেড়ে বসে পড়ল। প্রথমেই পরিবেশন করা হল সেই জালার শরবত। মুখে দিয়ে সবাই দেখে, খাঁটি শরবত কোথায় -- এ কেবাবে খাঁটি জল। শুধু বুরুই নয়—নিমন্ত্রিত সকলেই বুরুর মতো বুদ্ধিমান, সবাই ভেবেছে —সকলে খাঁটি শরবত আনছে যখন, তখন আমি এক ভাঁড় জল দিলে কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না—স্বাদেরও কোনো তফাত হবে না। এমন ভেবে সবাই জানাল জল ঢেলেছে, কেউ আর শরবত ঢালেনি।

মহাভোজ পণ্ড হল মন্দবুদ্ধিতে।

অগ্নি আর বরুণ শত্রু কেন

অনেক অনেক অনেক কাল আগের কথা। এক দেশের রাজার ছিল পরমা সুন্দরী এক কন্যা। তার পাণিপ্রার্থী ছিল অনেক রাজপুত্র। তারা এসে তাদের ইচ্ছের কথা রাজাকে বলত। দেখে-শুনে কাউকে রাজার মনে ধরত না। তিনি ভাবতেন, এ ছেলে আমার মেয়ের উপযুক্ত নয়, আরও ভালো পাত্র চাই।

অগ্নি আর বরুণও সেই রাজকন্যাকে বিয়ে করবে ভেবেছিল। তবে কেউ নিজের মনের কথা অন্যকে বলেনি। বরুণ মানে বৃষ্টি। একদিন সে সোজা রাজকন্যার কাছে গিয়ে তাকে বলল, হ্যাঁ গা রাজকন্যে, তুমি কী আমায় বিয়ে করবে?

রাজকন্যা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, আমি রাজি।

ঠিক সেই সময়ে অগ্নি এসে হাজির রাজার কাছে। সে বললে, মহারাজ, আপনি যদি আমায় সুপাত্র মনে করেন, তাহলে আমি আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে পারি।

অগ্নিকে দেখে রাজার মনে ধরল। তিনি বললেন, আমার তো ভারি পছন্দ তোমাকে। তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি।

একথা বলে রাজা মেয়ের কাছে গিয়ে বললেন, মা, তোমার জন্য যোগ্য পাত্র খুঁজে পেয়েছি। আমি অগ্নিকে কথা দিয়েছি।

রাজকন্যা বললে, তা কী করে হবে বাবা, আমি যে বরুণকে কথা দিয়েছি।

তা হলে কী হবে! তুমি তো একই সঙ্গে অগ্নি আর বরুণকে বিয়ে করতে পারো না!

এমন সময়ে অগ্নি আর বরুণ দুজনেই সেখানে এসে উপস্থিত। তাদের দেখে রাজা বললেন, রাজকন্যার বিয়ে স্থির হয়েছে।

আমার সঙ্গে? অগ্নি শুধোল।

আমার সঙ্গে? বরুণ শুধোল।

রাজা বললেন, ঠিক করেছি, তোমাদের মধ্যে এক দৌড়ের বাজি হবে, তাতে যে জিতবে, তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেব।

দৌড়বাজির দিন ঠিক হল, তা দেখতে অনেক লোক জমল। প্রতিযোগীদের মধ্যে অগ্নি এসে হাজির। কিন্তু বরুণ কোথায়? তার দেখা নেই। নির্ধারিত সময়ে দৌড় শুরু হল, তখনও বরুণের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। দৌড় প্রায় শেষ করে ফেলেছে অগ্নি, এমন সময়ে বরুণ এল বৃষ্টিধারা হয়ে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল, তাতে অগ্নি নিভে গেল—তার দৌড় আর শেষ হল না। একাই দৌড়ে বরুণ বাজি জিতে নিল। রাজকন্যার সঙ্গে বরুণের বিয়ে হয়ে গেল। সেই থেকে বরুণ আর অগ্নির সম্পর্ক হল চিরশত্রুতা।

দুই বান্ধবী

অনেককাল আগে এক গাঁয়ে বাস করত দুটি মেয়ে। মেয়ে দুটির গলায় গলায় ভাব। তাদের ভাষা এক, রুচি এক। তারা এক ছাঁদের পোশাক পরত। এক স্বাদের খাবার খেত। এক সঙ্গে মাঠে গল্প করত, এক সঙ্গে নদীতে জল আনতে যেত। সবাই বলত, গঙ্গা-যমুনা।

একদিন সে গাঁয়ে একটি ছেলে এসে হাজির হল। ওদের দেখে সে বলল, না ভাই। তোমরা যা বলছ ততটা জোরালো ওদের বন্ধুত্ব, আমার তো মনে হয় না। আঠার জোড় আলগা হতেই পারে। দেখব নাকি পরখ করে!

গাঁয়ের লোকেরা বলল, আচ্ছা দেখি।

পরদিন সকালে যখন দুই বান্ধবী গলা জড়াজড়ি করে পথ বেয়ে আসছে, তখন ছেলেটি পথের মাঝে এসে দাঁড়াল। বলল, সুপ্রভাত। আমি তোমাদের একজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সেকথা শুনে ওরা বলল, না, না, তা হবে না। আমরা দুজনে বন্ধু, যা বলতে চাও আমাদের দুজনের সঙ্গে বলতে হবে।

ছেলেটি বলল, কিন্তু আমি তো দুজনের সঙ্গে এক সঙ্গে কথা বলতে চাইনে। তবে তোমরা যদি চাও, তাহলে প্রথমজনের সঙ্গে যে কথা হবে, সে তার বন্ধুকে তা জানাতে পারবে।

এই বলে সে চাপা গলায় একটি মেয়েকে বলল, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ, তুমি... তুমি... তুমি—তোমার সঙ্গে কথা

বলতে চাই।

মেয়েটিও চাপা গলায় বলল, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

ছেলেটি তখন চলে গেল।

এবারে অন্য বন্ধু এসে মেয়েটিকে বলল, ছেলেটি তোকে কী বলল রে ...?

ওতো কিছুই বলেনি, চাপা গলায় শুধু বলল, তুমি... তুমি... তুমি...

আর আমার, আমার কথা কী বলল?

না, তোর কথা তো কিছুই বলেনি। বললাম না, শুধু বলেছে তুমি...তুমি...তুমি।

তবে তুই যে হ্যাঁ বললি। আমি পরিষ্কার শুনলাম। আজ তুই আমার কাছে কথা গোপন করছিস। আমায় তাহলে সব কথা তুই বলতে চাস না।

আমি তো বললাম, ও শুধু 'তুমি' বলেছে, আর কিছু না।

মানলাম তাই, তবে আমার সম্পর্কে কী বলেছে? সেটা বল।

আচ্ছা গোলমেলে মেয়ে তো! বলছি 'তুমি' এই কথা ছাড়া আর কিছু বলেনি ও।

তার মানে তুই আমাকে সত্যি কথাটা বলতে চাস না। তুই না আমার প্রাণের বন্ধু! ঠিক আছে, তোকে কিচ্ছু বলতে হবে না। আমি তোর বন্ধু ছিলাম ঠিক, তবে এখন আর বন্ধু নই।

ঠিক আছে, আমার এমন গোলমেলে বন্ধুর দরকার নেই।

তুই একটা মিথ্যেবাদী।

না, আমি মিথ্যে কথা বলি না। তুই তুই একটা বোকা, ...।

বলেই সে বাঁ হাতি পথ ধরল। অন্যজন ডানদিকের পথ ধরে এগোল। এমনকি যাবার সময় কেউ কারও দিকে ফিরেও চাইল না।

তাদের এতকালের অটুট বন্ধুত্ব এক মুহূর্তেই ফেটে চৌচির।

অগ্নি উৎসব

অনেককাল আগেকার কথা। দাগোম্বাদের সর্দারের ছিল একটি ছেলে। ছেলে-অন্ত প্রাণ তার। তাকে ছাড়া তার ঘুম আসত না রাতে।

একদিন সাঁঝবেলায় বাড়ির কাছে এক গাছের তলায় সর্দার বসেছিল, তাকে ঘিরেছিল অনুচর বন্ধুরা। বসে তারা গল্পগাছা করছিল। আবহাওয়া ছিল চমৎকার। ঝড়—বাদলের চিহ্নমাত্র ছিল না। কাছেই ঢাকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল—তার তালে তালে নাচছিল মেয়ের দল।

সর্দার বলল, দেখো, জীবন কত আনন্দময়। অমনি তার অনুচর-বন্ধুরা হাততালি দিয়ে সে কথার তারিফ জানাল। কোনো মন-পছন্দের কথা হলে তাকে হাততালি দিয়ে তারিফ জানানো দাগোম্বাদের প্রচলিত প্রথা।

কথা চলছে, এমন সময়ে সর্দারের বউ ছুটে সেখানে এসে বললে, সর্দার, এখন তো ছেলের ঘুমের সময় হল—

সর্দার বলল, হ্যাঁ, ঠিকই তো। ছেলে এখন তোমার কাছে বাড়িতেই রয়েছে।

সর্দারনি বললে, না তো—সে বাড়িতে নেই। আমি ভাবছিলাম, তোমাদের এখানেই বুঝি রয়েছে।

সর্দার সেকথা শুনে খেপে চিৎকার করে উঠল, বউ, বললাম তো, ছেলে এখানে নেই। যাও, চারদিকে খুঁজে দেখো।

বউ বললে, সর্দার, বললাম তো, চারদিক আমি খুঁজেছি, কোথাও পাইনি।

সেকথা শুনে সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, তোমরা নাচ-গান থামাও। ঢাকওলারা ঢাকে ছেলে হারানোর বোল তোলো—আমার ছেলে হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজতে হবে।

মুহূর্তের মধ্যে নাচ গান বন্ধ হল, ঢাকের বোল বদলে গেল। ঢাক বলতে শুরু করল, সর্দারের ছেলে হারিয়ে গেছে, তাকে পেলে তো সোজা সর্দারের বাড়ি নিয়ে এসো।

ছেলের খোঁজে দলে দলে লোক বেরিয়ে পড়ল। নানাদিকে খবর ছড়িয়ে গেল, কিন্তু ছেলের দেখা মিলল না।

তখন সর্দারের রাগ আরও বেড়ে গেল। সে বলল, কেউ বসে থাকবে না, ছেলের খোঁজে সবাই চলো।

গাঁয়ে আর কেউ পড়ে রইল না, সকলে ছেলের খোঁজে বেরুল। অনেকক্ষণ ধরে আঁতি পাঁতি করে খোঁজা হল। এবারে ছেলের দেখা পাওয়া গেল। বাড়ির কাছেই এক গাছের নীচে সে ঘুমোচ্ছে তখন।

তাকে দেখে সর্দার বলল, সোনা আমার—এবারে ওঠো।

সে ডাকে ছেলে সাড়া দিল না। সে তখন ঘুমিয়ে কাদা। সর্দার তাকে নাড়া দিয়ে আরও জোরে হাঁকল, খোকা, উঠে পড়ো। সে ডাকে ছেলে চোখ মেলল। বাবা—বলে ডেকে সর্দারকে জড়িয়ে ধরল।

অমনি ঢাকের বোল বদলে গেল। সর্দারের ছেলে পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে —পাওয়া গেছে।

ছেলেকে পেয়ে সর্দারের রাগ গিয়ে পড়ল গাছের ওপর। সে হুকুম দিল, গাছগুলো আমার ছেলেকে আড়াল করে রেখেছিল। তাই ওকে হারিয়েছিলাম। যাও, গাছগুলো জ্বালিয়ে দাও।

সর্দারের অনুচরেরা গাছের ডালে, গুঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল—গাছগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

খুশি হয়ে সর্দার ছেলে কোলে বাড়ি ফিরল। তার সঙ্গীরা আনন্দে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে পিছু পিছু চলল।

সেদিন থেকে প্রতি বছর জুলাই মাসে দাগোম্বারা অগ্নি উৎসব করে। সর্দার বাড়ি থেকে বেরোয়, লোকেরা মশাল জ্বালিয়ে নাচতে নাচতে গাছে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এখন অবশ্য এটা প্রতীকী হয়ে গেছে —পুরো গাছ আর জ্বালানো হয় না, একটা-দুটো ডালে আগুন ধরিয়ে উৎসবের পালা মেটে।

পবিত্র অজগর

অনেককাল আগে একবার নাইয়ার জাতির কিছু লোক দল বেঁধে বেরিয়েছিল শিকারে। দুর্ভাগ্য তাদের। সারাদিন অনেক পথ হেঁটেও তারা কোনো শিকারের সন্ধান পেল না। যখন সূর্য পাটে বসল, রাতের আঁধার নেমে এল, তখনও তারা বাড়ি থেকে বহুদূরে।

তাদের সর্দার তখন বলল, আজ এই বনেই আমাদের ঘুমোতে হবে—চলো, ঘুমোবার মতো একটি পরিষ্কার নিরাপদ জায়গা খুঁজে দেখি।

বনে থাকতে তাদের এতটুকুও ভয় করত না। যদিও তারা জানত, কখনো কখনো সিংহ, হাতি বা অন্য বুনো জানোয়ার ঘুমন্ত শিকারিদের মেরে ফেলেছে। তাছাড়া জঙ্গলে বদ মানুষের দেখাও মেলে। কিন্তু উপায় কী? খালি পেটে অত দূরের পথ পাড়ি দেওয়া যায় না।

খুঁজে খুঁজে একটা জায়গা পাওয়া গেল, যার অনেকটাই বড়ো বড়ো গাছে ঘেরা। ওরা ঠিক করল গাছে ঘেরা জমিতে ঘাসের ওপরে শুয়ে রাত কাটাবে। তারা কোনো আগুন জ্বালালো না। সঙ্গে সামান্য কিছু বাদাম ছিল, তা দিয়েই রাতের খাওয়া সারল। তারপরে ঘাসের বিছানায় গা মেলে দিল। সারাদিনের দারুণ পরিশ্রমে ওরা এত ক্লান্ত ছিল যে, অল্পক্ষণের মধ্যে তারা সকলেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল, কোনো শব্দও তাদের কানে পৌঁছোলো না। ওরা জানল না যে ওদের শত্রুরা তখন পায়ে পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

তখনই গাছের ডাল থেকে কী যেন একটা নীচে এসে পড়ল। সেই গাছের তলায় যে শিকারি শুয়েছিল, তার মাথার ওপর জিনিসটি পড়ায় সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। উঠে চোখ মেলে, তাকিয়ে তার চোখ ছানাবড়া। চিৎকার করে উঠল সে—অজগর, অজগর— ওঠো, তোমাদের মাথার ওপর এক অজগর ঝুলছে। ঘুমন্ত শিকারির দল হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ল। ওরা দেখল, ওদের শত্রুরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। লড়াই শুরু হল। শিকারির দল খুবই পটু—তারা জোর লড়াই শুরু করল। অল্পক্ষণে হেরে শত্রুরা রণে ভঙ্গ দিল। লড়াই থেমে গেল।

শিকারিরা এবারে বসে লড়াই নিয়ে কথা শুরু করল। ওরা বলল, ভাগ্যিস তুই উঠে চিৎকার করেছিলি, তাই আমাদের ঘুম ভাঙল। আরেকটু দেরি হলেই ওরা কেল্লা ফতে করে ফেলত। সাবাস ভাই!

সে বলল, দূর, আমি জাগাব কেন, আমাকেই তো জাগিয়ে দিয়েছিল এক অজগর। গাছের ডাল থেকে দড়াম করে আমার গায়ের ওপরে পড়ল—তাই তো আমি জেগে গেলাম। আমাকে জাগিয়ে দিল বটে, কিন্তু আমায় তো খেল না। ও তো অনায়াসেই আমায় গিলতে পারত। আমাদের জাগিয়ে দেবার জন্যেই ও আমার ওপরে পড়েছিল। ও কোনো সাধারণ অজগর নয়, ও নিশ্চয় পবিত্র অজগর।

তখন শিকারি দলের সর্দার বলল, আজ থেকে আমাদের দলের কেউ আর অজগর শিকার করবে না। অজগর আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। অজগর দেশের পবিত্র প্রাণী।

সেদিন থেকে নাইয়ার জাতির কাছে অজগর ভালোবাসার প্রাণী। যদি শেষ বর্ষার সময়ে ওদের বাড়ি যাও, তাহলে দেখবে সেখানে ঘরে ঘরে অজস্র অজগর ঘুরছে। সেই অজগর কাউকে কাটে না, এমনকি কোনো পোকা কী গিরগিটিও ধরে না।

ভিন্ দেশে দুই অভিন্ন বন্ধু

সারাদিন অনেক পথ হেঁটে দুই বন্ধু সাঁঝবেলায় এসে হাজির হল এক গাঁয়ে। সমস্ত দিনভর হেঁটে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, আর একটু বিশ্রাম না নিতে পারলে শরীর আর বইছে না। ভিন্ দেশ। ওরা গাঁও-বুড়োর সঙ্গে দেখা করে রাত কাটাবার জন্য একটু আশ্রয় চাইল।

গাঁও-বুড়ো বলল, হ্যাঁগো, তোমরা বাইরে থেকে আমাদের গাঁয়ে এসেছ, এতো আনন্দের কথা। তোমাদের অবশ্যই আশ্রয় দেব। তোমাদের মতো ভিনদেশি পথিকদের কথা ভেবেই তো তাদের রাত কাটাবার মতো আমরা একটা বিশ্রামাগার গড়েছি, তোমরা সেখানেই থাকতে পারবে। রাতের খাবারও ওখানেই পাবে। তবে একটা ছোট্ট কথা বলে দিই—ভিন্‌দেশিদের জন্যে বলা—নইলে গাঁয়ের লোকেরা তো এ পুরোনো প্রথার কথা জানেই। এখানে ভিন্‌দেশি কেউ রাতে ঘুমোনোর সময়ে যদি তার নাক ডাকে, তবে তার রেহাই নেই—সঙ্গে সঙ্গে সে জবাই হবে। এই ছোট্টো কথাটা মনে থাকবে তো!

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে তারা বিশ্রামাগারের পথে পা বাড়াল। গাঁও-বুড়ো ওদের সঙ্গে একটি ছেলেকে দিয়েছিল—সেই পৌঁছে দেবে, আর রাত খাবারের ব্যবস্থাও করে দেবে।

খাওয়াদাওয়া সেরে ওরা নরম বিছানায় গা ঢেলে দিল।

শ্রান্ত শরীরে তাড়াতাড়ি গভীর ঘুম নেমে এল।

কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ঘণ্টা না পেরুতেই দু'বন্ধুর একজনের নাক ডেকে উঠল—

ঘড় ঘড় ঘড়াৎ

ঘড় ঘড় ঘড়াৎ...

তা শুনে অপর বন্ধুর ঘুম ভেঙে গেল। সে বুঝল, সমূহ বিপদ। গাঁয়ের লোক নাকডাকার শব্দ শুনলে আর রক্ষা থাকবে না। বন্ধুটি ভালো গান গাইতে পারত। নাকের ডাকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে গান ধরল—

ঘড় ঘড় ঘড়াৎ
ঘড় ঘড় ঘড়াৎ
আমাদের জোর বরাত
অনেক পথ হেঁটে
এসেছি এই গ্রামে
যখন সন্ধ্যা নামে
ঠিক সন্ধ্যা নামে
এসেছি এই গ্রামে
আমরা তো এসেছি এই গ্রামে।

তার গান শুনে গাঁয়ের অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেল। তারা উঠে এসে আসর জমাল। কেউ কেউ গান জুড়ে দিল, কেউ নেচে আসর মাত করে দিল। বন্ধুটি কথার পরে কথা জুড়ে গানটি বাড়িয়ে চলল—

যখন সন্ধ্যা নামে
আমরা এসেছি এই গ্রামে
আমাদের নেই ভয়
গ্রামের মানুষ অতি সদাশয়

আমাদের প্রতি সদয়...

এমনি করে নাচে গানে রাত কেটে গেল। ভোরের আলো ফুটল। গ্রামের কেউ জানল না গান গাইবার আসল কারণটা কী? পরদিন সকালে নিজেদের গোছগাছ সেরে দুই বন্ধু চলল গাঁও-বুড়োর কাছে বিদায় নিতে। তাদের দেখে গাঁও-বুড়ো তো খুশিতে ডগমগ। সে বললে, অনেকদিন পরে তোমাদের সঙ্গে চমৎকার আনন্দে রাত কাটালাম। আমরা খুব খুশি হয়েছি। এই নাও, আমাদের খুশির চিহ্ন হিসেবে তোমাদের জন্যে সামান্য উপহার। ভালো থেকো। একথা বলে বুড়ো টাকা ভরা একটা থলে তাদের হাতে দিল।

পায়ে পায়ে ওরা গাঁয়ের পথ পেরিয়ে এল। গাঁ পেরুতেই টাকার ভাগ নিয়ে দুজনের তুমুল ঝগড়া বাধল। একজন বলল, বলো কীভাবে টাকাটা ভাগ করবে! আমি নিশ্চয় বড়ো ভাগ পাব। ভাগ্যিস আমার নাক ডেকেছিল, তাই তুমি গান গাইবার সুযোগ পেলে। বলো ঠিক কী না!

অপর বন্ধু বলল, আরে—তোমার নাক ডেকেছিল বলে তো তোমার গলা কাটা যাবার কথা। আমি গান গেয়েছিলুম বলে তুমি প্রাণে বেঁচেছ। সেজন্য তোমার উচিত আমায় ধন্যবাদ দেওয়া। টাকার বড়ো অংশ তো আমারই প্রাপ্য।

অন্য বন্ধু বলল, কখনও নয়, ওটা আমি পাব।

গাইয়ে বন্ধু বলল, কখনও নয়, ওটা আমি পাব।

ওদের ঝগড়া চলতে থাকল। চলতে চলতে গড়াল। গড়িয়ে চলল, গড়িয়ে চলল, গড়িয়েই চলল।

ছোট্ট পাখির লাল টুক্টুক্ পালক

এক গাঁয়ে থাকত একটি লোক। সঙ্গে থাকত তার বউ। তারা ছিল বেজায় গরিব, রোজকার খাবারের জোগাড় ছিল না তাদের। দিনরাত্তির খিদে পেত খুব।

লোকটি রোজই বনে যেত শিকারের খোঁজে, কিন্তু বড়ো শিকার তার জুটত না—আসলে সে ভালো শিকারি ছিল না তো। মাঝে মাঝে ছোটো খাটো পাখি শিকার করে বাড়ি ফিরত।

সেদিন তার বরাত ছিল মন্দ। বনে গেছে, এপার থেকে ওপার—সারা বন খুঁজে খুঁজে হয়রান। ছোটো-বড়ো কোনো পাখিই তার নজরে পড়ল না, শিকার তো দূরের কথা। মনের দুঃখ মনে রেখে ক্লান্ত শরীরে এক গাছের ছায়ায় বসেছে বিশ্রাম নিতে, ঠিক তখনই তার কানে এল একটি মিঠে সুর। ওমা দেখো, সেই গাছেরই ডালে বসে ছোট্ট এক লাল টুক্টুক্ পাখি প্রাণ মাতানো সুরে গান গাইছে।

তা দেখে সে তড়াক করে উঠে বসল। গাছের ডালে পাতার ফাঁকে বসে আছে পাখি। লোকটি তির ধনুকে হাত দিতেই পাখি বলে উঠল, শোনো, তোমায় দেখেই বুঝেছি, কত গরিব তুমি, দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না। একেবারে হাভাতে লোক। তাই তোমায় আমি সাহায্য করতে চাই। আমার একটি পালক তোমায় দিচ্ছি—বাড়ি ফিরে এটা রান্না কোরো, পেট ভরা খাবার জুটে যাবে। কাল আবার এসো, তোমায় পালক দেব—রান্না করবে। রোজ তোমায় পালক দেব, তোমার খাবার ভাবনা ঘুচে যাবে।

পাখিকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাল টুক্টুক্ পালকটি কুড়িয়ে নিয়ে লোকটি বাড়ির পথ ধরল। বাড়ি ফিরে উনুনের পরে একটি পাত্রে পালকটি রেখে বউকে বলল সব কথা ।

তার কথা শুনে বউ তো রেগে আগুন। সত্যি তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। সারাদিন না খেয়ে বসে হা পিত্যেশ করে আছি, কোথায় একটা শিকার আনবে—তা নয় পাখি ছেড়ে তার পালক কুড়িয়ে এনেছেন। পাখি আনলে অন্তত তার মাংসটুকু জুটত। পাখি না মেরে তার ধোঁয়ায় ভুলে পালক কুড়িয়ে এনেছে। দিনে দিনে অকম্মার ধাড়ি হচ্ছে। এখন মাংস ছেড়ে পালক খাও!

লোকটি তার কথার কোনো জবাব দিল না। উনুনে বসানো পালক-রাখা পাত্রখানির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। খানিকক্ষণ বাদে সে দেখে—আরে ব্বাস্! পাত্র ভরতি খাসা খানা তৈরি হয়ে গেছে, তার গন্ধে চারিদিক ম-ম করছে। এমন খানা তারা জীবনে চোখে দেখেনি।

পরদিন লোকটি ফের বনে গেল—পাখি তাকে আবার একটি পালক দিল। তা নিয়ে সে আনন্দে বাড়ি ফিরে এল।

এরপর থেকে লোকটি রোজই বনে যায়, আর পাখি তাকে একটি করে পালক দেয়, বাড়ি ফিরে সেই পালক পাত্রে রেখে উনুনে বসায়, পাত্র বোঝাই সুস্বাদু খানা দুজনে পেট পুরে খায়। রাতের বেলা ভরা পেটে ঘুমোতে যায়।

এমনি একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় লোকটি তো বেজায় খুশি। কিন্তু তার বউ একটুও নয়। সে ছিল ভারি লোভী। ভাবল, এক পালকেই যদি এক পাত্র খাবার জোটে তো তিন-চারটে পালকে কত্তো খাবার হবে। পেট পুরে পোলাও-কালিয়া খুব মজা করে খাওয়া যাবে। সে তার বরকে বলল, কী ছাই একটা করে পালক আনছ রোজ—পাখিটাকে মেরে আনতে পারছ না? কত্তো পালক, কত্তো ভোজ! কত মজা হবে বলো তো!

লোকটি বলল, ছিঃ, ও কী কথা! পাখি আমার বন্ধু, খুব উপকারী বন্ধু, ওকে কী আমি মারতে পারি?

একদিন হল কী, রোজকার মতো লোকটি যখন বনের পথ ধরেছে, তার বউও চলেছে পিছু পিছু। লোকটি তার কিছুই টের পায়নি। গাছের ডালে বসে পাখি মিঠে সুরে গান গাইছিল, লোকটি উপকারী বন্ধুর কাছে এসে দাঁড়াল। ঠিক তখনই লোভী বউ উপকারী বন্ধুকে এক মস্ত পাথর ছুঁড়ে মারল। পাখিটি মরে টুপ্ করে লোকটির পায়ের কাছে পড়ল। দুঃখে বেচারির কথা বন্ধ হয়ে গেল। বউ ছুটে এসে পাখিকে মাটি থেকে তুলে নিল—আঃ, আজ কী মজা হবে, পোলাও-কালিয়া-কোর্মা-কাবাব কত খাবার আজ

বানাব। হা হা হা হি হি হি...

পাখি নিয়ে বউ বাড়ি ফিরে এল। লোকটিও এল সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ি ফিরে বউ পেল্লায় হাঁড়ি চেয়ে এনে তিন চারটে পালক ছিঁড়ে রান্না চাপাল। কতক্ষণ কেটে গেল—পালকগুলো পালকই রয়ে গেল, একদানা খাবারও হল না।

লোভী ছেলের গল্প

একটা লোভী ছেলের গল্প বলি। ছেলের নাম আনানমি। একবার আনানমিদের দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হল। আনানমি তার ভাইবোনদের নিয়ে ভীষণ আতান্তরে পড়ল। ছেলেটা তো খাবার ছাড়া আর কিছুই জানত না।

ওঃ—এই খিদেটাই আমায় মেরে ফেলবে। প্রায়ই খেদ করত আনানমি। একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবল, আচ্ছা—কটা মাছ ধরলে হয় না!

সে কথা ভেবেই সে সমুদ্রের তীরে বসে পড়ল। আর বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল কখন একটা মাছের দেখা মেলে। সে দেখছে, দেখছে আর দেখছে কিন্তু কোনো মাছের দেখা মিলল না। দেখতে দেখতে সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ একটা সবুজ দ্বীপ তার চোখে পড়ল। সমুদ্রের পাড় থেকে একটা লাল নৌকো চড়ে সে সবুজ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছোলো।

নৌকো ছেড়ে দ্বীপে উঠে এক বাদাম গাছের নীচে এসে দাঁড়াল সে। তার মাথার কিছু ওপরে মস্ত এক কাঁদি নারকেল ঝুলছিল। সে গাছে চড়ে নারকেল পাড়তে গেল। কাজটা সহজ নয়, তবু সে চেষ্টা ছাড়ল না। অনেকবার চেষ্টা করে শেষে একটা নারকেল হাতে পেল। সে নারকেলটা নিয়ে তার লাল নৌকো লক্ষ করে ছুঁড়ল। নৌকোর কাছাকাছি গেল বটে, কিন্তু নারকেল পড়ল সমুদ্রের জলে, জলে পড়েই সে ভেসে গেল।

তা দেখে সে হতাশ হল না, বরং আরও উৎসাহে আরেকটা নারকেল পাড়ল। নারকেলটা তার লাল নৌকো লক্ষ করে ছুঁড়ল। এটাও নৌকোর কাছাকাছি গিয়ে সমুদ্রের জলে পড়ে ভেসে গেল। আসলে এত জোরে হাওয়া বইছিল যে তার লক্ষ ছাড়িয়ে নারকেল ঝোড়ো বাতাসে উড়ে শেষে জলে পড়ে ভেসে যাচ্ছিল। সাত সাতটা নারকেল জলে ফেলে সে চেষ্টায় ক্ষান্তি দিয়ে নীচে নেমে এল। কান্নায় তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছিল। কিন্তু শত কান্নাতেও কোনো নারকেল আর ডাঙায় ফিরল না।

সে তখন কাঁদতে কাঁদতে বনের ভেতরে প্রবেশ করল। বনের ভেতরে ছোটো একটা কুটির নজরে এল তার। সে কুটিরের সামনে হাজির হতে দোর খুলে এক বুড়ি মানুষ বেরিয়ে এলেন। কোমল কণ্ঠে বললেন, কী হয়েছে গো? কাঁদছ কেন? আমায় ভয় পেয়ো না...আমি বন্ধু তোমার। সব কথা খুলে বলো আমায়।

আনানমি তখন তাকে সব কথা বলল। দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, কোথাও খাবার মেলে না—বড়ো কষ্টে আছে তারা। আজকে এই দ্বীপে এসে কত মেহনত করে সাত সাতটা নারকেল পেড়েও তা হারানোর দুর্ভাগ্যের কথাও বলে ফেলল সে।

বুড়ি মানুষ তার সকল কথা শুনলেন, বললেন—কেঁদো না বাছা, আমি তোমায় একটা জিনিস দিচ্ছি—নিয়ে যাও। তোমার নারকেলের চেয়ে অনেক ভালো হবে। বলে তিনি একটা পেতলের হাঁড়ি এনে তার হাতে দিলেন। বললেন, এই নাও, এই হাঁড়িটা নিয়ে বাড়িতে ফিরে মাকে এটা দেবে, তা হলে তোমার মা আর পরিবারের কেউ না খেয়ে কষ্ট পাবে না। যখন খাবার দরকার হবে, তখন হাঁড়িটা সামনে রেখে তাতে এই মন্ত্রটা বলতে বলবে— হাঁড়ি হাঁড়ি যা দিতে বুড়ি মাকে

তাই দাও আমাকে।

আনানমি তক্ষুণি হাঁড়িটা বগলদাবা করে তাঁকে প্রণাম সেরে বেরিয়ে পড়ল। আর তর সয় না তার, বাড়ি যাওয়া দূরের কথা, নৌকোর কাছেই এল না। একটা গাছের আড়ালে এসে বলল, হাঁড়ি হাঁড়ি যা দাও বুড়ি মাকে

তাই দাও আমাকে।

অমনি হাঁড়ি ভরা বিরিয়ানি বাতাসে গন্ধ ছড়িয়ে হাজির। এমন সুন্দর খাবার সে তো জীবনে খায়নি। চেটেপুটে পেট ভরে সবটা সে খেয়ে নিল। তারপরে মুখে ঢেঁকুর তুলে নৌকায় উঠল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু তার মাকে হাঁড়িটা দিল না। সে মনে মনে ভেবেই নিল, এটা তো আমারই হাঁড়ি, আমি কেন অন্যদের দেব। আমার খুব খিদে পায়, আমার যখন ইচ্ছে হবে, খাব। একথা ভেবে কাউকে কিছু না জানিয়ে হাঁড়িটা এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখল।

রোজই মা সব ছেলেমেয়েকে নিয়ে খাবারের সন্ধানে বাইরে বের হন। আনানমি শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে বাইরে যায় না। সকলে চলে গেলে সে লুকোনো জায়গা থেকে হাঁড়ি বের করে নানান সুস্বাদু খাবার খায়।

তার মা, ভাই, বোনেরা কম খেয়ে ক্রমেই রোগা হতে হতে কাঠি-পানা হয়ে যায় আর আনানমি দিনে দিনে ফুলতে থাকে।

আনানমির চেহারার বাড়বাড়ন্ত দেখে তার এক ভায়ের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। সে ভাবে, এ রহস্যটা তাকে ভেদ করতেই হবে।

পরদিন সে সবার সঙ্গে বেরিয়েও বাড়ি ফিরে এল। এক ফাঁকে কখন ঘরে ঢুকে পড়ল, যা আনানমি জানতেও পারল না। সে অন্যদিনের মতো হাঁড়ি বের করে মন্ত্র উচ্চারণ করে খাবার এনে আরাম করে সব সাবাড় করল। তার পরে হাঁড়ি গোপন জায়গায় রেখে দিল। তার ভাই লুকিয়ে সবই দেখল, কিন্তু কিচ্ছু বলল না। তারপরে মা বাড়ি ফিরলে তাঁকে সবকথা বলে দিল। তা শুনে মায়ের খুব দুঃখ হল। হায়, এমন কু-পুত্রের মা আমি! পরিবারের সবাইকে বঞ্চিত করে ও একাই ভালো ভালো খাবার খায়! এত স্বার্থপর ও!

পরেরদিন মা আর বেরোলেন না, তিনি আনানমির সঙ্গে তাঁর সব ছেলেমেয়েদের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলের কথা মতো গোপন জায়গা থেকে হাঁড়ি বের করে, মন্ত্র পড়ে অনেক খাবার পেয়ে গেলেন। ভাবলেন ছেলেমেয়েরা এ খাবার পেলে কী খুশিই না হবে!

বিকেলে ছেলের দল ফিরলে মা ওদের খেতে ডাকলেন। শরীর ভালো নেই বলে কিছু না খেয়ে আনানমি নিজের ঘরে চলে গেল। ঘরে গিয়ে গোপন জায়গায় হাঁড়িটা পেল না।

পরদিন সকালবেলা মা সেই হাঁড়ি নিয়ে গ্রামের হাটে গেলেন। সেখানে সব লোক আসে। তারপরে সবাইকে ডেকে মন্ত্র পড়ে হাঁড়ি থেকে সুস্বাদু খাবার বের করে খাওয়াতে লাগলেন। গ্রামের আধপেটা খাওয়া মানুষের কাছে সে খাবার অমৃত। এমনি করে পঞ্চাশ হাঁড়ি খাবার বেরুবার পরে অনেক গরমে হাঁড়ির পেতল গলতে শুরু করল। একসময়ে পুরো হাঁড়িটাই গলে গেল। হতভাগ্য মায়ের হাতে আর কিছুই রইল না।

এভাবে সবাইকে খাওয়ানোতে আনানমি খুব চটে গেল। মার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। সেদিনই সে নদী পেরিয়ে সবুজ দ্বীপে বনের মাঝে সেই বুড়ির বাড়িতে হাজির হল। বলল, ‘বুড়ি মা আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে, মার বোকামিতে হাঁড়িটা গলে গেছে। আমি এতদিন একা একাই খাচ্ছিলাম, মা জানতই না, কাল কী করে জানতে পেরে আজ গাঁয়ের খেতে না পাওয়া সব মানুষকে খাওয়াতে গেছে। বুড়ি মা, তুমি আমায় আর একটা হাঁড়ি দাও, আমি কাউকে ছুঁতেও দেব না।

বুড়ি মা বলল, না বাপু, আমার কাছে তো আর কোনো হাঁড়ি নেই, তবে এই ছড়ি গাছটা আছে। এতে তোমার কাজ হতে পারে। আগে যেমন বলতে—হাঁড়ি হাঁড়ি যা দিতে বুড়ি মাকে/তাই দাও আমাকে। এখন হাঁড়ির বদলে ছড়ি গাছকে বলবে, তা হলেই ঠিক ফল পাবে।

বুড়ির কাছ থেকে ছড়ি গাছাটি নিয়ে আনানমি ছুটল তার নৌকোর পানে। নৌকো সমুদ্রে ভাসিয়ে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না। সঙ্গে সঙ্গে বলল,

ছড়ি গাছা ছড়ি গাছা
যা দিতে বুড়ি মাকে
তাই দাও আমাকে...

তার কথা শেষ হতে না হতেই তার পিঠে দমাদ্দম ছড়িগাছার বাড়ি পড়তে লাগল। পিঠ ছেড়ে তার গাবদা মু ে খ র ওপে ব ও পড় ল ছড়ি ব বাড়ি । ওবে বাপরে-বাবারে-মারে-মরে গেলুম রে বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল আনানমি। এমন ছড়ির ঘা কীভাবে থামাবে, তা তো জানে না, কিন্তু এমন পিটুনি তো আর সহ্য হয় না। সে জলে ঝাঁপ দিল। হাবুডুবু খেতে খেতে অনেক কষ্টে সাঁত্রে তীরে এসে উঠল।

তারপরে বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল, কিন্তু কাউকে তার দুরবস্থার কথা বলতে পারল না। তবে এই ছড়ির ঘা তাকে শুধরে দিয়েছিল। লোকে বলে, এখন সে যা পায়, তাই সবার সঙ্গে ভাগ করে খায়। ভাই-বোনদের তো দেয়-ই। পাড়া প্রতিবেশীদেরও ভাগ দেয়।

পাহাড় চুড়োয় আগুন

অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। কেনিয়া রাজ্যে ছিল একটি হ্রদ যার জল ছিল বরফের মতো ঠান্ডা। রাতে সেখানে অনেক জানোয়ার জল খেতে আসত, কিন্তু কোনো মানুষ রাতের বেলা বুনো জানোয়ারের ভয়ে কখনও সে হ্রদের ধার ঘেঁসত না।

সে দেশে এক ধনী মানুষের খুব সুন্দরী এক মেয়ে ছিল। মেয়ে ক্রমে বড়ো হল—তার রূপ ফেটে পড়ছে যেন। ধনী মানুষটির মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল। তিনি ঘোষণা করলেন—আমার মেয়ের এবারে বিয়ে দেব। তবে একটি শর্ত আছে। শর্তটি হল এই যে, অভিলাষী পাত্রকে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ওই হ্রদের জলে থাকতে হবে। ওই ঠান্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবে থেকে এক রাত যে পার করে দিতে পারবে, আমার মেয়ের সঙ্গে সেই ছেলের বিয়ে দেব।

তারপরে দিনের পরে দিন গেল—কেউ তাকে বিয়ে করতে হ্রদের জলে নামল না। একে হিমশীতল জল, তারপরে বুনো জানোয়ারের দল, সে হ্রদে কে আর মরতে যাবে? তখন এক গরিব ছেলে ঠিক করল, সে হ্রদের জলে নেমে রাত কাটাবে, আর ধনী লোকের মেয়েকে বিয়ে করবে। তার ইচ্ছের কথা সে জানাল তার বুড়ি মাকে।

তা শুনে মা কেঁদে বলল, না, না তা কী করে হয়? তুই আমার একমাত্র ছেলে, এই হ্রদে রাতের বেলা অনেক বুনো জন্তু আসে জল খেতে। ভয়ানক সব জানোয়ার তারা। মানুষ পেলে তারা কপ্ করে গিলে খাবে। না বাপ, ওখানে যাস্ নে।

বুড়ি তো মানা করে, কিন্তু ছেলে কী তা শোনে! সে বলল, মা, শোনো—এমন করে কেঁদো না। আমি ওই হ্রদে যাব—ওই মেয়েকে আমি যে বড্ড ভালোবাসি।

এবারে সে গেল মেয়েটির বাবার কাছে। বলল, আপনি বলেছেন ওই হ্রদের ঠান্ডা জলে রাত ভোর থাকতে পারলে আপনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, আমি ওই হ্রদের জলে সারারাত কাটাব।

ধনী লোকটি বললে, আজ সাঁঝের বেলায় যাচ্ছ তো!

সে সম্মতি জানাতে ধনী তার দুজন চাকরকে পাঠাল, যাতে একটু দূর থেকে তারা ছেলেটির গতিবিধি লক্ষ করতে পারে।

ধীরে ধীরে আঁধার নামল—ছেলেটি চলল হ্রদের জলে নামতে, আর তার মা চলল ছেলের পিছু পিছু, অবশ্য একটু আড়ালে থেকে, যাতে ছেলে তাকে দেখে না ফেলে। হ্রদ থেকে চল্লিশ কদম দূরে ছিল এক ছোট্ট পাহাড়, সেই পাহাড়ে উঠে বুড়ি মা কাঠ কুটো দিয়ে একটু আগুন জ্বালাল, যাতে করে বুনো জানোয়ারেরা ভয়ে জল খেতে হ্রদের দিকে পা না বাড়ায়।

ছেলেটি তো হ্রদে গিয়ে জলে নেমেছে। তারপরে পাহাড়ের চুড়োয় আগুন দেখে বুঝেছে যে তার মা এসেছে। মনে মনে সে ভাবল, সত্যি সত্যি মা যে কী ভালো। আমাকে এত ভালোবাসে! ভেবে তার দু চোখ জলে ভরে গেল। মায়ের ভালোবাসার কথা ভাবতে ভাবতে সেই হিমশীতল জলেও তার কষ্ট অনেক কমে গেল।

ভালোয় ভালোয় রাত কেটে গেল, সকাল হল। ছেলেটি জল থেকে উঠে সোজা গেল সেই ধনীলোকটির বাড়ি। বলল, কাল রাত তো হ্রদের জলেই কাটিয়েছি—এবারে বিয়ের আয়োজন করুন।

ধনী বলল, না হে, তা তো হবে না। আমার লোকেরা দেখেছে, হ্রদের ধারে পাহাড় চুড়োয় আগুন জ্বলছিল। হ্রদ থেকে পাহাড় হল চল্লিশ কদম দূর। ওই আগুনে জল গরম হয়ে গিয়েছিল—তাই তুমি সারারাত জলে কাটাতে পেরেছ। শর্ত ছিল ঠান্ডা জলে রাত কাটানো। শর্ত পূরণ করোনি, তাই আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে না। এবার তবে এসো।

একথা শুনে খুবই রেগে গেল ছেলে। শহরের কাজির কাছে গিয়ে অভিযোগ জানাল।

কাজি বললেন, ঠিক আছে, ঠিকঠাক বিচার তুমি পাবে। কোনো ভয় নেই।

কাজির ডাক পেয়ে পরদিন সকালে ছেলেটি তার মাকে নিয়ে তার দরবারে হাজির হল। ধনীলোকটিও তার চাকরকে নিয়ে সেখানে হাজির। এমন মজার বিচার দেখতে কাজির দরবার। লোকের ভিড়ে ভেঙে পড়ল।

কাজি তাঁর আসনে বসে এক পাত্র জল এনে পাশে রাখলেন। তারপরে চল্লিশ কদম হেঁটে গিয়ে কয়েকটুকরো কাঠ নিয়ে আগুন জ্বালালেন। তারপর বললেন, একটু অপেক্ষা করা যাক, ওই পাত্রের জল গরম হলে আমরা উঠব।

লোকেরা বলল, তা কী করে হবে? অত দূর থেকে কী আগুন জল গরম করতে পারে? এ আপনি কী বলছেন!

কাজি বললেন, তা হলে তোমরাই বলো, চল্লিশ কদম দূরের আগুন কী করে হ্রদের জল গরম করতে পারে?

মামলা সেখানেই শেষ। ধনীর মেয়ের সঙ্গে সেই জেদি ছেলেটির বিয়ে হল। ওরা আনন্দে আহ্লাদে জীবন কাটাতে লাগল।

আকাশের গায়ে বাড়ি

অনেককাল আগে। আবুনুবাম বলে একজন লোক ছিল। লোকটা বেজায় গরিব। তবে তার খুব বুদ্ধি আর বেশ মজাও করতে পারত। বড়োলোকদের নিয়ে সে মজা করত, এমনকি রাজাকে নিয়েও।

একদিন রাজামশাই আবুনুবামকে ডেকে পাঠালেন, রাজবাড়িতে এল আবুনুবাম ।

রাজামশাই বললেন, আবুনুবাম, আমি শুনেছি তুমি খুব বুদ্ধিমান। আচ্ছা বাপু, তিনদিনের মধ্যে আমাদের গাঁয়ে আমার জন্যে একটা বাড়ি বানিয়ে দিতে পারো? একাজে তোমার যত লোকের দরকার হবে তা পাবে তুমি। আর তা যদি না পারো তবে আমার ফৌজের লোক তোমায় মেরে ফেলবে।

আবুনুবাম বললে, হ্যাঁ রাজামশাই, আমি আপনাকে বাড়ি গড়ে দেব। এই বলে সে বাড়ি চলে এল, আর এসেই ভাবতে বসল। ভেবে ভেবে শেষে একটা বড়ো মাপের ঘুড়ি বানাল সে, তার গায়ে একটা ঘণ্টা বাঁধল। শক্ত লম্বা দড়িতে সেটা ঝোলাল। যখন বাতাস বয়, ঘুড়ি আকাশে অনেক উঁচুতে উঠে যায়। কিন্তু বেশি দূরে যায় না। আবুনুবাম ঘুড়ির দড়ি একটা গাছের ডালে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে।

পরদিন শহরের সকলে শুনল, একটা ঘণ্টা বেজে চলেছে। আর আকাশের গায়ে কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে। রাজাও ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলেন, দেখলেন—আকাশের গায়ের সেই ছাপটিও। আবুনবাম রাজার কাছে এসে বললে—বা জামশাই, আকাশের গায়ে আপনার বাড়িটি শিগগিরই গড়া হবে, আপনি ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন? কারিগরেরা আকাশ থেকে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। আপনার ফৌজের লোকেদের বোর্ড নিয়ে আকাশে চড়তে বলুন।

রাজা বললেন, আমার লোকেরা আকাশে উঠবে কী করে?

আবুনুবাম বললে, রাস্তা তো রয়েছে।

রাজা তাঁর ফৌজের লোকেদের আবুনুবামের সঙ্গে যেতে বললেন। তারা আবুনুবামের পিছু পিছু বোর্ড নিয়ে চলতে লাগল। শেষে সেই ঘুড়ি বাঁধা গাছের গোড়ায় এসে থামল তারা।

ঘুড়ি বাঁধা দড়ি দেখিয়ে আবুনুবাম বললে—এই যে পথ দেখছ, এই পথ বেয়ে সোজা আকাশে উঠে যাও।

ফৌজি লোকেরা দড়ি বেয়ে উঠতে গেল, পারল না। আবার চেষ্টা করল, পারল না। আবার চেষ্টা করল। পারল না। শেষে চেষ্টা করা ছেড়ে দিল।

আবুনুবাম বললে, না বাপু, চেষ্টা ছাড়লে হবে না। আমাদের রাজামশাই জানো তো ভারি রাগি মানুষ। এই বোর্ডগুলো আকাশবাড়িতে পৌঁছে না দিলে খুব রেগে যাবেন।

বারে বারে চেষ্টা করেও আকাশে উঠতে না পেরে ফৌজি লোকেরা রাজার কাছে এসে বলল, না রাজামশাই, মানুষের পক্ষে পায়ে হেঁটে আকাশে ওঠা সম্ভব নয়।

রাজা কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপরে বললেন, ঠিক বলেছ। পায়ে হেঁটে আকাশে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার।

তা শুনে আবুনবাম বললে, তা হলে বুঝু ন রাজামশাই, আকাশে বাড়ি করতে বলে আমাকে কী বিপদেই না ফেলেছিলেন। এমনকি, না পারলে গর্দান নেবার হুকুমও দিয়েছিলেন।

রাজা মুখ চুন করে বসে রইলেন।

আবুনুবাম সেই গাছতলায় গিয়ে ডাল থেকে দড়ি কেটে ঘুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

সেরা সওদা

একটি ছিল লোক আর ছিল তার তিন ছেলে। তারা তিনজনেই ভালোবাসত একটি মেয়েকে। তিনজনাই সে মেয়েকে একটি কথাই শুধাত—আমায় বিয়ে করবে? তারা তিনজনাই যথেষ্ট বুদ্ধিমান, সুদর্শন আর শক্তিধর। মেয়েটিও তাদের তিনজনকেই ভালোবাসত; বুঝতে পারত না, ওদের মধ্যে সেরা কে?

একদিন বাবা তিন ছেলেকে ডেকে বললে—এই নাও তোমরা সকলেই একটা করে টাকার থলে, এতে অনেক টাকাই আছে। টাকার থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। ঘুরে ঘুরে দেশ দেখো, আর সবচেয়ে কাজের বলে যে জিনিসটি মনে হবে, সেটা কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরো।

টাকার থলি নিয়ে তিন ছেলেই বেরিয়ে পড়ল। অনেক দেশ ঘুরে মনের মতো জিনিস কিনে তারা ফেরার পথ ধরল। বড়ো ছেলে এনেছে এক জাদু গালিচা। চোখের পলকে সে শূন্যে উড়ে যেখানে খুশি যেতে পারে। মেজো ছেলে এনেছে এক জাদুদর্পণ। সে চাইলে যা খুশি, যাকে খুশি সেই দর্পণে দেখতে পাবে।

আর ছোটোছেলে এনেছে এক জাদু লেবু—যার রস খেলে কী ছেলে কী মেয়ে, কী কচি কী বুড়ো—যত কঠিনই অসুখ হোক না কেন, তা সেরে যাবেই। রোগী বেঁচে উঠবে।

তিন ভাই এবারে তাদের সেরা সংগ্রহ অন্য ভাইদের দেখাল। মেজো ভাই বলল, আমরা তো এখন বাড়ির অনেক দূরে আছি। আমাদের প্রিয় মেয়েটিকেও কতদিন দেখিনি, আর, এই জাদু দর্পণে তাকে দেখি।

সে তার জাদু দর্পণ বের করে আনল। তিনজনেই সেই দর্পণে চোখ রেখে দেখে যে মেয়েটির কঠিন অসুখ হয়েছে। তা দেখে ছোটো ছোটো ভাই তার জাদু গালিচায় উঠে বসতে বলল, আর তখনই ওরা তিনজনে মেয়েটির কাছে পৌঁছে গেল। ছোটো ভাই জাদু লেবু বের করে সঙ্গে সঙ্গে তার রস মেয়েটির মুখে ঢেলে দিল। এক ঢোক খেয়েই মেয়েটি চোখ মেলল। তার শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে, রোগের চিহ্নমাত্র নেই তার চেহারায়।

তা দেখে ছেলেরা সবাই খুব খুশি হল।

ওরা বলল, তাহলে বলো মেয়ে, আমাদের মধ্যে কাকে তুমি বিয়ে করবে?

মেয়ে বলল, তোমরা সবাই আমার প্রিয় বন্ধু। মেজোর জাদু আয়নায় দেখে আমার অসুখের কথা তোমরা জানতে পেরেছিলে। আমার জীবন বাঁচানোর কাজে জাদু দর্পণ খুব কাজ দিয়েছে। এটা খুব কাজের জিনিস—এটা তোমার কাছে চিরকাল থেকে যাবে। বড়ো আমার অসুখের খবর জেনে তোমাদের সকলকে নিয়ে নিমেষে এখানে এনে ফেলেছে। আমার জীবন বাঁচানোর কাজে জাদু গালিচা খুব কাজ দিয়েছে। এটা, খুব কাজের জিনিস—এটা চিরকাল তোমার কাছে থাকবে। আর তোমাদের একজন আমায় লেবুর রস দিয়ে প্রাণ বাঁচাল। আমি বেঁচে গেলাম, কিন্তু ওর লেবু তো আর রইল না। আমাকে বাঁচাতে ও সর্বস্ব দিয়েছে। আমি তা হলে ওরই হই।

আর ভায়েরা সেকথা শুনে বলল, ঠিক কথাই বলেছ।

জাদু পাত্র

অনেককাল আগে এক বুড়ি বাজারে স্যুপ বিক্রি করত। বাজারে এত ভালো স্যুপ আর পাওয়া যেত না। বুড়ি বেচত চিকেন স্যুপ। কেউ বুড়ির নাম জানত না, কোথায় সে থাকে, তাও কেউ জানত না, কেউ জানত না, তার সেরা স্যুপ বানাবার রহস্যটা কী। আরও আশ্চর্য, স্যুপটা সবসময় গরম থাকত। তবে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। তারা ওর কাছ থেকেই স্যুপ কিনে আরাম করে খেত।

প্রতিদিন সকালের আলো ফুটতে না ফুটতে মাথায় কালো রঙের পেল্লায় হাঁড়িটা চাপিয়ে বুড়ি বাজারে চলে আসত স্যুপ বেচতে। এসে এক গাছের নীচে বসত গরম স্যুপের হাঁড়ি নিয়ে। তার স্যুপের এমন চাহিদা যে দেখতে দেখতে তা পুরো বিক্রি হয়ে হাঁড়ি শেষ হয়ে যেত।

বাজারের কাছে এক বাড়িতে একটি ছেলে থাকত। তার নাম কালারি। সে-ও স্যুপ খেতে খুব ভালোবাসত। বুড়ি কোথায় থাকে, কোত্থেকে স্যুপ আনে তা জানতে ছেলের খুব কৌতূহল হল।

একদিন বেচাকেনা শেষ করে খালি হাঁড়ি মাথায় বুড়ি বাজার ছাড়ল, আর তার পিছু পিছু চলল কালারি। বুড়ি হাঁড়ি মাথায় আপন মনে পথ চলেছে —সে দেখেইনি যে কালারি তার পিছনে আসছে। অনেকটা পথ হেঁটে বুড়ি এক পাহাড়ের সামনে এল, তারপরে সে তরতর করে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে গেল। সন্ধে নামল, কালারির মনে ভারি ভয়, আবার কৌতূহলও খুব, তাই ভয়ে ভয়েই চলল, বুড়ির পিছু ছাড়ল না সে।

শেষে পাহাড়ের টং-এ একটি মাটির বাড়ির সামনে এসে বুড়ি থামল। সেখানে ছিল মস্ত বড়ো একটি জালা। বাব্বা, কালারি মনে মনে ভাবল, এত বড়ো জালাও হয়! বুড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে যেতে কালারি এগিয়ে এসে জালাটি দেখল। জালাটি উঁচু প্রায় কালারির মাথায় মাথায়—এ্যাত্তো বড়ো। দু পায়ে ডিঙি মেরে সে দেখল, জালাটির পেটে কিচ্ছুটি নেই, একেবারে ফাঁকা।

এমন সময় বাড়ি থেকে বুড়ি বেরিয়ে এল আর কালারি আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। বুড়ি জালার কাছে এসে গুণগুণ করে গান গাইতে লাগল—

জাদু জালা স্যুপ আনো
মুরগি স্যুপ লালা ঝরানো
জলদি আনো জলদি আনো।
তোমার স্যুপের সোয়াদ পেতে
গাছতলাতে বাটি পেতে

সবাই বসে আইন মেনে
লম্বা স্যুপের লাইন টেনে
যেমন কথা সবই জানো
জলদি আনো জালা ভরা
স্যুপের জোগান, জলদি পাবো।
জাদু জালা জলদি খাবো।

গান শেষ হতেই স্যুপ তৈরি হয়ে গেল। স্যুপের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভরে গেল। গরম স্যুপের ধোঁয়া জালার ওপরে উঠতে লাগল। সারাদিন হেঁটে ছুটে কালারির খুব খিদে পেয়েছিল। যেই বুড়ি তার বাড়ি গেছে, অমনি সে জালার কাছে স্যুপের দিকে লোভী লোভী চোখে তাকিয়ে রইল। দেখে, কোথাও কোনো চুলোর চিহ্ন মাত্র নেই, অথচ বিনা আগুনে স্যুপ টগবগ করে ফুটছে আর তার মিষ্টি সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

না, এমন স্যুপ ছাড়া একটুও ঠিক হবে না। একথা ভেবেই কালারি জালার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে এক টুকরো মুরগির মাংস ধরতে গেল। হায়রে, ঠিক সেই সময়ে বুড়ি তার বাড়ি থেকে বেরুল। স্যুপের জালায় কালারির ডোবানো হাত তার চোখে পড়েছে।

একী! একী! একী! একী! বলে বুড়ি চেঁচিয়ে ধেয়ে এল।

কালারি কী আর দাঁড়ায়? সে ছুট লাগাল। ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের নীচে নেমে এল। বুড়িও তার পিছু পিছু ছুটল বটে, কিন্তু পাকা ছেলের সঙ্গে কী ছুটে পারে?

কালারি ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এল। তার বাবা মা পাড়া প্রতিবেশী সকলকেই বুড়ির জাদু জালার কথা বলল।

কোথাও আগুন নেই তবু স্যুপ তৈরি হয়ে তার মিষ্টি বাস বাতাসে ভাসে।

গাঁয়ের মানুষেরা কেউ আর সে পাহাড়ের দিক মাড়ায় না। তবে তারা সেই জাদু জালা থেকে বেরোনো ধোঁয়া দেখতে পায়।

আর কোনোদিন সেই বুড়িকে মাথায় হাঁড়ি ভরা স্যুপ নিয়ে বাজারে আসতে কেউ দেখেনি। কেউ আর পাহাড় চুড়োয় তার বাড়ির পথে পা বাড়ায়নি। তারা তখন সেই বুড়িকে ভয় পেত। এখনও যখন পাহাড়ের মাথা কালো মেঘে ঢেকে থাকে, তারা বলে—দেখো, দেখো , বুড়ির জাদু জালায় স্যুপ ফুটছে। তার ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মাথা জুড়ে।

পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গল্প

তোমরা কি পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গল্পটার কথা জানো? জানো না তো? বলছি তবে, শোনো।

অনেককাল আগে। এক দেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি নিজেও অনেক গল্প জানতেন। যখন গল্প-বলিয়েরা গল্প বলে যেত, তিনি মাঝে মাঝে তাদের থামিয়ে দিয়ে গল্পের বাকিটুকু শুনিয়ে দিতেন।

একবার তিনি লোক পাঠালেন দেশ জুড়ে সেরা গল্প-বানিয়েদের ধরে আনতে।

তারা গাঁ-শহর ঘুরল, আর বলল, আমাদের রাজাকে লম্বা গল্প শুনিয়ে খুশি করলে অনেক অনেক উপহার পাবে। হ্যাঁ, গল্প শুনিয়ে রাজার মুখে হাসি ফোটাতে হবে কিন্তু!

তা শুনে অনেকে এল, রাজাকে কত লম্বা লম্বা গল্প শোনাল। মজা করে রাজাকে হাসাতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিস্‌সু হল না। সব শুনে রাজা বললেন, দূর্, এটা তো লম্বা গল্প নয়ই। আর এতে তো হাসিরও কিছু দেখছি নে।

সব শেষে একটি ছেলে এল। বলল, রাজামশাই, আমি আপনাকে একটা লম্বা গল্প শোনাব, গল্প শুনে আপনার মুখে হাসিও ফুটবে।

রাজা বললেন, বেশ, তা হলে বসে পড়ো আর শুরু করো তোমার লম্বা কাহিনি।

ছেলেটি গল্প শুরু করল—

অনেক দিন আগে আবানবাউ বলে একটা লোক ছিল। সে ছিল এমন পেটুক যে-কোনো লোকই তাকে পেট ভরে খাওয়াতে পারত না। যতই খাক না কেন, কিছুতেই তার পেট ভরত না। সেই দেশের রাজা আবানবাউ-এর কথা শুনে বললেন, ভারি মজা তো, যাও, ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি ওকে পেট পুরে খাওয়াব।

আবানবাউকে আনতে লোক ছুটল, আর রাজা হাজার হাজার পাত্র বোঝাই মাংসের স্যুপ, চাপাটি, ফল আনতে বললেন।

তা আনতে একশো উট হিমসিম খেয়ে গেল। অনেক লোক জমল আবানবাউ-এর আহার দেখতে।

আবানবাউ এল। ঢাক বাদকেরা ঢাক বাজাল। গানের শিল্পীরা গানে গানে আকাশ ভরিয়ে ফেলল। উপস্থিত সবাই সেই সুরে কণ্ঠ মেলাল। আবানবাউ রাজাকে মস্ত সেলাম করে উপস্থিত সকলকে বলল, এবারে আমায় দেখুন—একথা বলেই মাখনের স্যুপের বাটি ধরে এক চুমুকে সবখানি শেষ করল। এমনি করে সে খেতে লাগল—খেতে লাগল আর খেতে লাগল...

তা বেশ বোঝা গেল, তারপরে কী হল? রাজা শুধোলেন।

আঃ রাজামশাই, এটা সবে প্রথম পাত্রের কথা বলছি, এখনও তো হাজার হাজার পাত্র রয়েছে। একটু ধৈর্য ধরুন।

তারপর সে খেতে লাগল। খেতে লাগল। খেতে লাগল।

ক্রমে সন্ধ্যা নামল। ছেলেটি গল্প বলছে... আবানবাউ খেয়ে চলেছে, খেয়ে চলেছে, খেয়ে চলেছে... খেয়ে চলেছে....

শেষ পর্যন্ত রাজামশাই বললেন, থামো, আজ অনেক হয়েছে, কাল সকালে ফের গল্প শুনব।

পরদিন সকালে ফের ছেলেটির তলব হল। সে এলে রাজা বললেন, বলো তোমার আবানবাউ-এর কাহিনি। তারপরে কী হল?

ছেলেটি বলল, সে কী বলব রাজামশাই, আবানবাউ কী শুধুই খাচ্ছে, পানও করছে, কলশি কলশি জল পান করছে আর খাবার

খাচ্ছে, আর জল খাচ্ছে।

ছেলেটি নামতা পড়ার মতো বলে চলেছে —খাবার খাচ্ছে আর জল খাচ্ছে। যত সে বলছে ততই তার গলা চড়ছে।

খাবার খাচ্ছে আর জল খাচ্ছে। জল খাচ্ছে আর খাবার খাচ্ছে।

রাজা এবার ছেলেটির দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, চমৎকার, খুব ভালো হয়েছে তোমার গল্প। এটা ঠিক পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গল্প। এবারে থামো। একটু বিশ্রাম নাও।

তা শুনে রাজার পানে চেয়ে ছেলেটি গল্প থামাল।

রাজা তাকে অনেক উপহার দিলেন। সে উপহার সব নিয়ে রাজার মস্ত এক উটে চেপে বলতে বলতে চলল, খাবার খাচ্ছে, জল খাচ্ছে...খাবার খাচ্ছে..., জল খাচ্ছে... খাবার খাচ্ছে... জল খাচ্ছে...জল খাচ্ছে...খাবার খাচ্ছে...

সিংহের তিনটি কেশর

যখন মেলাবের বয়স এগারো বছর, তখন তার মা মরে গেল। এখন সংসার কে দেখবে ভেবে মেলাবের বাবা বিজুনেস বলে এক মহিলাকে বিয়ে করে নিয়ে এল।

বিজুনেস মেলাবকে ছেলের মতো ভালোবাসলে কী হবে, মেলাব তাকে একটুও পছন্দ করত না। বিজুনেস তার জন্যে রোজ সকালে চমৎকার জলখাবার তৈরি করে রাখত, দুপুরের খাবার, রাতের খাবারও তেমনি যত্ন করে ওর মনের মতো করে রাঁধত। বেচারির পরিশ্রমই সার, মেলাব সেসব খাবার মুখেও তুলত না। ছেলের জন্যে সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে আনত। ছেলে সেদিকে চোখও তুলত না। বাহারি জুতো পছন্দ করে আনত—সেগুলোর ঠাঁই হত নদীর জলে। বিজুনেস যখন ছেলের সঙ্গে কথা বলতে যেত, সে তখন ঘরের বাইরে ছুট দিত।

একদিন বেচারি বিজুনেস মেলাবকে বলল, আমি সারা জীবন একটি ছেলে চেয়েছি, এখন তোমায় পেয়েছি, তুমি আমার কত আদরের ধন, তা কি তুমি বোঝো না?

কিন্তু মেলাব রেগে কড়া গলায় জবাব দিল, শোনো, আমি স্পষ্ট করে বলছি—আমি তোমার ছেলে নই, তুমি কখনও আমার মা নও। আমার মা মরে গেছে। আমি তোমায় ভালোবাসি না। কখনও ভালোবাসব না। বাসব না — বাসব না।

তা শুনে বিজুনেসের মনে খুব দুঃখ হল। সারারাত কেঁদে চোখ লাল করে পরের দিন সকালে ছুটল গাঁয়ের জ্ঞানী বুড়োর বাড়ি। তাঁকে সব কথা খুলে বলল। সে কত ভালোবাসে মেলাবকে, অথচ সে তার ভালোবাসার কোনো দামই দেয় না।

বুড়ো বলল, হ্যাঁ, এটা একটা ভাবনার কথা বটে। ঠিক আছে, তোমায় আমি পথ বাতলে দেব—তবে তার আগে আমায় সিংহের তিনটি কেশর এনে দিতে হবে।

ওরে বাবা, সিংহের কেশর! তা আনতে গেলে তো সিংহ আমায় খেয়ে ফেলবে।

তা আমি কী করব? তবে আমার মদত পেতে গেলে তোমায়, হুঁ যা বললাম, তা করতেই হবে। চেষ্টা করে দেখোই না, পেতেও তো পারো।

কী আর করবে বিজুনেস—সে চলল সিংহের কেশরের খোঁজে। তাকে যেতে হল অনেক অনেক দূরে সেই সেখানে, যেখানে সিংহ থাকে। তাকে দেখে সিংহ তো রাগে গরগর করে গর্জন করে উঠল। তার বেশ খিদেও পেয়েছিল। তা বুঝে বিজুনেস কী আর সেখানে থাকে! মুহূর্তে পগার পার।

পরের দিন সে ফের সিংহের কাছে এল—সঙ্গে খানিক মাংস। একটু দূর থেকে সে মাংস রেখেই দৌড়ে পালিয়ে এল। সিংহ মাংস দেখে এগিয়ে এসে মাংস সাবড়ে দিল।

পরের দিন বিজুনেস ফের খানিক মাংস নিয়ে এল। এদিন সে সিংহের অনেকটা কাছে এগিয়ে এসে মাংস রাখল।

সিংহ সেটাও খেয়ে ফেলল।

প্রতিদিনই সে সিংহের জন্য মাংস নিয়ে আসে আর আরও একটু এগিয়ে গিয়ে মাংস রাখে। সিংহ তাকে কিচ্ছুটি বলে না—সে বুঝেছে, মেয়েটি তার বন্ধু। তাই আর আগের মতো রেগে গরগর করে না, বরং মেয়েটিকে দেখে সে খুশিই হয়।

শেষে একদিন বিজুনেস সিংহের একেবারে সামনে গিয়ে নিজের হাতে তার মুখে মাংস তুলে দিল। তার গায়ে আদরে হাত বুলোতে বুলোতে তিনটে কেশর তুলে নিল। সিংহ তাতেও কিচ্ছুটি বলল না, একটুও রেগে গেল না।

সেই তিনটি কেশর নিয়ে বিজুনেস ছুটল জ্ঞানী বুড়োর কাছে। তাকে কেশর তিনটে দেখিয়ে বলল, এই তো এনেছি সিংহের তিনটি কেশর। বলুন, এবারে ছেলেটিকে কী করে সামলাব?

বুড়ো বললেন, আমি আর কী বলব। তুমি তো নিজেই সব করে ফেলেছে । বুদ্ধি খাটিয়ে, ধৈর্য ধরে একটু একটু করে ধাপে ধাপে সিংহকে বশ করে তার কেশর তুলে এনেছ। আমার বিশ্বাস, এমন ধৈর্য ধরে ধাপে ধাপে এগিয়ে তুমি নিশ্চয় মেলাবকে বশ করে তার ভালোবাসা নিশ্চয় আদায় করে নিতে পারবে।

প্রকৃত সুখী মানুষ

অনেককাল আগে আফ্রিকার উত্তরের এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর অঢেল ধন ছিল, অনেক রানি ছিল, ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু রাজার মনে একটুও সুখ ছিল না। রাজা ভাবতেন, আমার সব আছে তবু আমি সুখী নই কেন? আব কী থাকলে সুখী হব তা তো আমি নিজেই জানি না।

একদিন তিনি রেগে তাঁর সভাসদদের বললেন, বলো, আমার মনে সুখ নেই কেন? সুখী হতে হলে আমার আর কী দরকার?

এক সভাসদ বললে, রাজামশাই, আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন, সেখানে কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে, কত তারা ফুটেছে।

দেখলেই মনে হবে, জীবনটা, কী সুখের, কত আনন্দময়। এমন আকাশের ছবি আপনার মন সুখে ভরে দেবে।

না বাপু, না—রাজা রেগে বললেন, অমন আকাশের দিকে চাইলে আমার মন হতাশায় ভরে যায়। কারণ আমি জানি, অমন সুন্দর জিনিসগুলো তো আমি কখনও পাব না।

তখন আরেক সভাসদ বললে, কিন্তু গান শুনতে পারেন নিশ্চয়। গানের সুরে দুঃখী মনও ভালো হয়ে যায়। অবসাদ কেটে যায়। আমরা বরং সকাল থেকে রাত—অষ্টপ্রহর গানের আয়োজন করি। গান শুনে আপনার মন সুখে ভরে যাবে।

তা শুনে রাজার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। না বাপু, না, কী যে বোকার মতো কথা বলো বুঝি না। গান শোনা ভালো। তা বলে সকাল থেকে সন্ধে, দিনের পরে দিন গান শোনা! ওঃ শুনেই আমার মাথা ঘুরছে। দিনের পর দিন গান শোনা, না

বাপু, কখ্‌খনো না, না না!!

তখন সবাই সভা ছেড়ে বাড়ি চলে গেল। রাজা মুখ ভার করে একাই দরবার ঘরে বসে রইলেন। এমন সময় এক সভাসদ দরবারে ফিরে এসে প্রণাম করে রাজাকে বলল, রাজামশাই, অনেক ভেবে আমার একটা কথা মাথায় এসেছে। যদি অনুমতি করেন তো বলি।

অত ভণিতা না করে কথাটা বলে ফেল না—রাজার গলায় রাগ ঝরে পড়ল। বলো, আমায় কী করতে হবে।

না, তেমন কিছু নয়, সভাসদটি বললে, খুবই সহজ কাজ। একজন প্রকৃত সুখী মানুষকে খুঁজে বের করে তার জামাখানা যদি পরে ফেলতে পারেন। তবেই কেল্লা ফতে। আপনিও ওই লোকটির মতোই প্রকৃত সুখী মানুষ হয়ে যাবেন।

রাজা বললেন, বাঃ, তোমার কথাটা বেশ মনে ধরেছে। এবারে লোক লাগিয়ে দেশের সবচেয়ে সুখী লোকটাকে ধরে আনা যাক।

রাজামশাই তাঁর সেনাদের বললেন, তোমরা সারা দেশ-গাঁয়ে খুঁজে প্রকৃত সুখী একজন লোককে ধরে নিয়ে এসো।

রাজার কথামতো সেনারা তো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তাঁর কথামতো প্রকৃত সুখী লোক খুঁজে তো পাওয়াই যায় না।

শেষে এক ছোট্ট গাঁয়ে এক সেনা দেখল, একজন লোক ভারি গরিব, কিন্তু বলছে, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

লোকটা গরিব বটে, কিন্তু মুখে তার হাসিটি লেগে আছে আর গলায় গান। সেই সেনা লোকটিকে ধরে রাজার বাড়িতে হাজির হল।

তার কথা শুনে রাজার মন ভরে গেল। যাক, শেষ পর্যন্ত আমিও এবারে সুখী মানুষটি হচ্ছি। এবারে তার কাছ থেকে জামাটা নিয়ে পরে ফেললেই হল। সেনাকে বললেন, যাও, লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

রাজার ঘরের দরজা খুলে গেল। একটি ছোটোখাটো কালো রঙের মানুষ হাসিমুখে ঘরে ঢুকল।

রাজা বললেন, এসো বন্ধু, কাছে এসো। তোমার জামাখানা এবারে খুলে ফেল।

লোকটি হাসিমুখে রাজার একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা তার দিকে ভালো করে চাইলেন—আরে, তিনি এটা কী দেখছেন? পৃথিবীর সব চেয়ে সুখী যে মানুষ, তার গায়ে এক ফালি জামাও নেই।

মাখনবাটিতে টাকা

এক গাঁয়ে একটি লোক থাকত। একবার অনেকদিনের জন্য তার দূর দেশে যাবার দরকার হল। তার অনেক টাকাকড়ি ছিল, সে একটা মাখনের পাত্রে সেগুলো রেখে তার ওপর মাখনের তাল চাপিয়ে ঢাকা দিল। সে পাত্র দেখে বোঝার উপায় রইল না যে, মাখনের তালের নীচে টাকা কড়ি রাখা আছে।

তারপরে সেই পাত্রটা নিয়ে সে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গেল। তাকে বলল, ভাই, আমি একটু দূরদেশে যাচ্ছি, কবে ফিরব ঠিক নেই, এই পাত্রটা তোমার কাছে রাখতে চাই, আমি দেশে ফিরে ফেরত নেব।

প্রতিবেশী বলল, ঠিক আছে, রেখে দিচ্ছি। ভালোভাবেই রাখব। চিন্তা করবেন না, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুরে আসুন।

ক্রমে একমাস কেটে গেল, মানুষটা ফিরল না। ওর মাখনটা নষ্ট হয়ে গেল কীনা কে জানে? তাই প্রতিবেশী মাখনের পাত্রটা এনে তা থেকে সব মাখন বের করল। মাখন বের করে দেখে —ওমা, মাখনের নীচে এত টাকাকড়ি রয়েছে! তা দেখে প্রতিবেশীর মনে লোভ হল। সেসব টাকাকড়ি নিয়ে সেই জায়গায় ছোটো ছোটো কয়েকটা পাথরের টুকরো রেখে দিল। তারপরে মাখনের তাল চাপা দিল।

একদিন লোকটি ফিরে এসে প্রতিবেশীর কাছে মাখনের পাত্রটি ফেরত চাইল। পাত্রটি নিয়ে ফেরত নিজের বাড়ি ফিরল। তারপর মাখনের পাত্রে টাকাকড়ির খোঁজ করতে গিয়ে তার চোখ কপালে উঠল। আরে—টাকাকড়ি সোনাদানার চিহ্নমাত্র নেই, সেখানে রয়েছে, হায়, কয়েক টুকরো পাথর মাত্র। তা দেখে লোকটা রেগে আগুন হল, কিন্তু প্রতিবেশীকে কিচ্ছু বলতে পারল না। মনে মনেই জ্বলতে থাকল।

একদিন এক বন্ধু এল তার বাড়ি। তার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে বলল, এ কী বন্ধু— তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে বলো তো।

ওঃ, আমি একটা বুদ্ধু। কী যে করি। বলে সেসব ঘটনা বন্ধুকে খুলে বলল। মাখনের ডেলার নীচে রাখা টাকাকড়ি, সোনাদানা কী করে পাথরের টুকরোয় পরিণত হয়েছে, সে কাহিনি বন্ধুকে শোনাল।

সব শুনে বন্ধু বলল, ঠিক আছে। তোমার টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। সে কথা তোমায় পরে বলব। তবে এখন একটু জঙ্গলে চলো।

দু-বন্ধু গাঁয়ের পাশের জঙ্গলে গিয়ে একটা ছোটোমতো বাঁদর ধরে, তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

বন্ধুটি এবারে লোকটিকে বলল, যাও ভাই, তোমার প্রতিবেশীকে বলো তার ছেলেটিকে একবারের জন্যে দিতে। তুমি বাজারে

গিয়ে কিছু খাবার কিনবে, সেটা বয়ে আনতে তোমায় সাহায্য করবে সে।

লোকটা গিয়ে প্রতিবেশীর কাছে ছেলেটির কথা বলল। সে সঙ্গে সঙ্গে খুশি মনে ছেলেটিকে এনে দিল। ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে এল তার বন্ধুর কাছে। বন্ধু এবার ছেলেটিকে নিয়ে একটা ঘরে তালা বন্ধ করে রাখল আর লোকটির হাতে দড়ি বাঁধা বাঁদরটিকে দিয়ে বলল, যাও, প্রতিবেশীদের ছেলে ফেরত দিয়ে এসো।

লোকটা বাঁদরটিকে নিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ি গেল। বলল, নাও বাপু, তোমাদের ছেলে ফেরত নাও।

এ কী, ছেলে কোথায়! একটা বাঁদর এনে ছেলে বলছ? চালাকি নাকি? বানর ফেরত নিয়ে গিয়ে তুমি এক্ষুনি আমার ছেলে এনে দাও বলছি।

বলছি তো, এটা তোমার ছেলেই। টাকাকড়ি সোনাদানা যদি ক'দিনে পাথরের টুকরো হতে পারে তো বলো, একটা ছেলে বাঁদর হয়ে যেতেই পারে।

তখন প্রতিবেশী সবকিছু বুঝতে পেরে তার সিন্দুক থেকে লোকটার সোনাদানা-টাকাকড়ি সব ফিরিয়ে দিল। লোকটাও ছেলেকে বন্ধ ঘর থেকে বের করে এনে তার বাপমায়ের কাছে ফিরিয়ে দিল।

বন্ধুর বুদ্ধিতে সহজেই হারানো টাকা-সোনা সব উদ্ধার হল। সে বন্ধুকে ওই টাকার ভাগ দিতে চাইলে বন্ধু আপত্তি করে বলল, তুমি আমার বন্ধু না? বন্ধুর প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করা তো বন্ধুরই কাজ। তার জন্যে কী কেউ টাকা নেয়? কখ্খনো না, কখ্খনো না।

যমজ ভাইয়ের গল্প

অনেককাল আগে সেরকি গাঁয়ে একটি বউ-এর যমজ ছেলে হল। চমৎকার স্বাস্থ্যবান দুটি ছেলে।

সেই যমজের মধ্যে এইবা যার নাম, তার ডান হাতে ছিল এক সাদা জড়ুল। আর তার ভাই সাইবা যার নাম, তার বাঁ হাতে ছিল জোড়া সাদা জড়ুল। এমন সুন্দর এক জোড়া ছেলে পেয়ে মা-বাবার যেমন আনন্দ হল, তেমনি বিষাদে মন ভরে গেল। একথা শুনে তোমাদের মনে হতেই পারে—তা কেন? সে কারণটা এবারে বলি—

সেরকির গাঁ-সমাজে একটা বিশ্রী রীতি ছিল। যমজ সন্তান হলে তাকে তখুনি মেরে ফেলতে হবে। এবারেও গাঁও-বুড়ো ওদের বাপকে ডেকে বলল, তোমার যমজ ছেলেদের এবারে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করো।

কিন্তু বাপ-মায়ের প্রাণ! তারা কি অত সহজে সন্তানের মৃত্যু চাইতে পারে! তারা দুজনেই বলল, বলছ কী?

বুঝতে পারছ না, কী বলতে চাইছি? দুই মূর্তিমান দুটি অমঙ্গলকে খতম করোনি কেন? যাও, এবারে ঝাড়ে বংশে বিদেয় হও। এ গাঁয়ে তোমাদের আর ঠাঁই নেই। আজকেই এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে—যদি কোনোদিন এ গাঁয়ের ত্রিসীমানায় তোমাদের কারও ফের দেখা পাই তো ছেলে, ছেলের বাপ সকলকে তক্ষুনি নিকেশ করব।

কী আর করা! এইবা–সাইবা-র হাত ধরে তার বাবা-মা গাঁ ছেড়ে বনের ভেতরে চলে গেল। সেখানে নতুন ঘর বেঁধে বাস করতে লাগল।

অনেক বছর বনে কাটল তাদের। বনে জীবনধারণ সহজ নয়। বুনো জানোয়ার মেরে, ফল পাকুড় খেয়ে জীবন কাটে। এইবা সাইবা সেই কষ্ট সয়ে বড়ো হল। কী সুন্দর হল চেহারা তোদের। ব্যবহারও কত ভালো তাদের। বাবা-মায়ের কত কাজে লাগে।

একদিন বনে কাঠ কাটতে গিয়ে একটা লোকের সঙ্গে দেখা। গাছতলায় শুয়ে সে ধুঁকছিল। ওকে সেবা যত্ন করে ওরা বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল। সে বলল, না বাপু, আমার বাঁচার কোনো আশা নেই, এখুনি মরব আমি। আমাদের গাঁ সেরকি থেকে আমি এসেছি। সেখানে ভয়ানক যুদ্ধ চলছে। আমরা যথেষ্ট লড়াই দিচ্ছি, কিন্তু শত্রুপক্ষ খুব শক্তিশালী। তাদের তিরের আঘাতে আমি তো মরছি। পারলে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করে আমাদের গ্রামকে রক্ষা করো। —একথা বলে সে ঢলে পড়ল।

এইবা-সাইবা দুভাই সেরকি রক্ষা করার লড়াইয়ে তক্ষুনি যেতে চায়, কিন্তু তার বাবা-মার মনে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবার স্মৃতি জ্বলজ্বল করছিল। তারা ওদের লড়াইয়ে যেতে দিতে রাজি হল না। তারা বলল, গাঁও-বুড়ো তোমাদের পছন্দ করত না। যখন ছোট্টটি ছিলে, তখন তোমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল। ওর জন্যেই তো গাঁ ছেড়ে এত কষ্টে আমরা বনে আছি।

যমজ ভাইয়েরা তবু সেরকি গাঁয়ে যেতে চায়। ওটা আমাদের দেশ। আমাদের দেশের মানুষকে বাঁচাতে আমাদের লড়তে হবেই।

একথা বলে তারা লড়াই করতে সেরকি চলে গেল এবং গাঁয়ে এসে দারুণ লড়াই শুরু করল। তাদের পরাক্রমে শত্রুপক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়ে দেশ ছেড়ে পালাল। যুদ্ধ শেষ হল।

গাঁও-বুড়োর বাড়িতে এবারে বিজয় উৎসব শুরু হল। সাইবা এইবা তো ভোজসভা আলো করে বসল। একদল গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল, আমাদের সঙ্গে দুই সাহসী তরুণ আছে। তাদের যুদ্ধের কাছে আমাদের শত্রুরা হেরেছে। কিন্তু আমরা সাহসী দুই যোদ্ধার পরিচয় জানি না।

সে ভোজসভায় যমজ ছেলে দুজনের কাকা হাজির ছিল। সে বলল, গাঁও-বুড়ো, তোমার মনে পড়ে, আঠারো বছর আগে আমার দাদা-বউদি এই গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল—তাদের যমজ ছেলে হয়েছিল বলে। সেই ছেলেদের একজনের ডানহাতে একটা সাদা জড়ুল ছিল আর ছোটো ছেলের বাঁ-হাতে এক জোড়া সাদা জড়ুল ছিল। যমজ ছেলে বলে তুমি তাদের মেরে ফেলতে বলেছিলে। তারা সেই ছেলেদের মারতে রাজি না হওয়ায় ওদের গাঁ ছাড়ার হুকুম দিয়েছিলে। এই বীর দুজন হল সেই দুই যমজ ছেলে।

গাঁও-বুড়ো এইবা-সাইবা-র কাছে মাপ চেয়ে নিল। আর অনেক উপহার দিয়ে পাঠাল বনে ওদের বাবা-মায়ের কাছে।

সসম্মানে তাদের গাঁয়ে ফিরিয়ে আনল।

সেইদিন থেকে যমজ সন্তান হলে তাদের হত্যা করার প্রথা সে গাঁ থেকে উঠে গেল।

অলস মাকড়সা

এক মাকড়সা ছিল ভীষণ আলসে। রোজ সে দুপুর বারোটায় ঘুম থেকে উঠে জলখাবার খাবে। খাওয়া শেষ হলে বলবে, আমি এখন আমাদের খামারে যাচ্ছি।

কিন্তু সে খামারে যেত না। আসলে তাদের তো কোনো খামার ছিলই না। সে বনের ভিতরে চলে যেত। সেখানে মস্ত এক গাছের নীচে গিয়ে বসত। বসে বসেই সারাদিন কাটিয়ে দিত।

তার বউ কখনো কখনো তাকে বলত, যদি খেতের কোনো কাজে আমার সাহায্য দরকার হয় তবে বলো। আর কিছু সে বলত না, কারণ মাকড়সাকে খুবই ভয় পেত সে।

মাকড়সা বলত, আরে এখনও ঢের সময় আছে, ভয় পাচ্ছ কেন? যখন তোমার সাহায্য প্রয়োজন হবে, তখন নিশ্চয় ডেকে নেব।

অন্যরাও বলত, কী হে, কখন তোমার খেতের কাজ শুরু করবে?

জবাব দিত সে, অত তাড়া কীসের, এখনও ঢের সময় আছে।

একদিন মাকড়সা তার বউকে বলল, কাল আমি খেতে বাদাম বুনব। তুমি বাজারে গিয়ে এক থলে বাদাম কিনে আনো।

কাল সকালেই আমার বাদাম চাই।

তার কথা শুনে বউ খুশি হল, অলস বর বাবাজির সুমতি হয়েছে তাহলে! সে বাদাম কিনতে বাজারে ছুটল। পরদিন সেই বাদাম নিয়ে মাকড়সা বনে গেল। গাছতলায় বসে যত পারল বাদাম ভেঙে খেল, পেট ভরে বাদাম খেয়ে গাছতলায় শুয়ে দিল লম্বা ঘুম। সাঁঝবেলায় ঘুম ভাঙলে বাড়ি ফিরে এল। ফিরে বউকে বলল, সারাদিন খেতে খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খিদেও পেয়েছে খুব। খাবার তৈরি তো, নাকি সারাদিন আড্ডা মেরেই কাটালে? আমাদের জীবনটা সত্যিই বড়ো কঠিন। আমরা ছেলেরা সারাদিন খেটে খেটেই মরি, আর মেয়েরা তোমরা দুবেলা দুটি রেঁধে আরামসে আড্ডা মেরে দিন কাটাও।

এমনি করে সে তো রোজই বেরোয়, খেতে কোনো কাজ করে না। বাদাম খেয়ে গাছতলায় শুয়ে তোফা ঘুম দিয়ে সাঁঝবেলায় বাড়ি ফেরে। আর বউ-এর ওপর তম্বি করে।

দিনের পর দিন কাটে। এবার ফসল তোলার দিন এল। লোকেরা খেত থেকে বাদাম তোলা শুরু করল। মাকড়সা তো কিছুই আনে না। ভয়ে বউ তখন শুধাল, আরে সকলেই তো খেতের বাদাম আনছে, তোমার খেতের বাদাম কই? আমি কী তোমায় সাহায্য করব?

না, না, তোমার সাহায্য আমার চাই না। দাঁড়াও না, আর কদিনের মধ্যে আমাদের খেতের বাদাম তোলা শুরু করব।

কথাটা তো বউকে বলল বটে, কিন্তু বাদাম আনবে কোত্থেকে। সে তো বাদাম বোনেই- নি। আর বুনবেই বা কোথায়—তার তো কোনো খেতই নেই।

এবারে সে সত্যি প্যাঁচে পড়ে গেছে। কোত্থেকে বাদাম জোগাড় করি। তবে কি...ঠিক আছে — বাদাম চুরি করলে কেমন হয়? আমি বাদাম চুরিই করব।

সে রাতে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের প্রধানের খেতে গেল। সেখানে মস্ত খেতে প্রচুর বাদাম ফলেছে। সেখান থেকে বাদাম তুলে এক থলি বোঝাই করে বনের ভেতরে এক জায়গায় রেখে বাড়ি ফিরে এল। পরদিন সকালে মাকড়সা বলল, আমি আজ খেতের বাদাম আনব। খুব ভালো করে রাঁধবি। আজ বাদাম তুলতে বড়ো পরিশ্রম হবে। খুব ভালো রাতের খাবার তৈরি করে

রাখবি।

নিশ্চয়, খুব সুস্বাদু খাবার তৈরি করে রাখব, বউ খুশি হয়ে বলল।

'বনে গেল মাকড়সা। যেখানে বাদামের থলিটা রেখেছিল, তা সেখানেই ছিল। তা থেকে খানিকটা বাদাম খেল।

তারপর ঘুম লাগাল। সাঁঝের বেলায় বাদামের থলিটা নিয়ে বউয়ের কাছে গেল। বাদাম দেখে বউ ভারি খুশি। সে ব্যাগ থেকে একটা বাদাম নিয়ে ভেঙে খেল। খুব সুস্বাদু বাদাম। আর একটা বাদাম ভেঙে খেল। আরও একটা। কী ভালো যে খেতে!

তারপরের দিনও মাকড়সা গেল গ্রাম প্রধানের খেতে। সেখান থেকে ফের এক বড়ো থলে বোঝাই বাদাম চুরি করে চোরাই বাদাম বনে রেখে এল। সাঁঝবেলায় সেই থলে বয়ে বউ-এর এনে দিল।

এমনই চলে রাতের পর রাত, দিনের পরে দিন। চুরি করা বাদাম খেয়ে বউ-এর মুখে হাসি ফোটে। ওদিকে গ্রাম প্রধানের বাড়ির পাহারাওলার হুঁশ হয়—আর খেতের বাদাম যে চুরি যায়। চোর ধরার সে এক নতুন মতলব ঠাউরাল। বনে গিয়ে রবার গাছের ডাল কেটে রস বের করে তা জ্বাল দিয়ে বাদামি রঙের রবারের মণ্ড তৈরি করল। তারপর মণ্ড দিয়ে একেবারে মানুষের আকারের পুতুল বানাল। তারপরে নরম রবারের পুতুলটাকে নিয়ে বাদাম গাছের কাছে রেখে দিল। সে এবার চোরটাকে হাতে নাতে ধরা যাবে।

রাত নিঝুম হল, গ্রামের সবাই ঘুমে বেহুঁশ, শুধু মাকড়সা জেগে আছে —সে বাদাম চুরি করতে যাবে। তার বউ ঘুমুলে সেও বেরুল। বাদাম খেতে পৌঁছে সে দেখে যে, খেতে কে একটা লোক দাঁড়িয়ে। সে শুধাল, কে? কে দাঁড়িয়ে আছ? কে দাঁড়িয়ে আছ ওখানে?
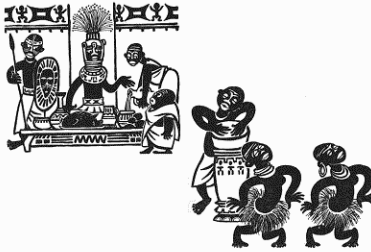
কেউ জবাব দিল না।

মাকড়সা আবার শুধাল, কে ওখানে? জবাব দিচ্ছ না কেন?

কোনো জবাব এল না।

মাকড়সা ফের বলল, কে ওখানে দাঁড়িয়ে? রাতের বেলা ওখানে করছ কী?

রবারের পুতুল কোনো জবাব দিল না।

তখন মাকড়সা আরও রেগে বলল, কেন আমার কথার জবাব দিচ্ছিস না। এ কথা বলেই তার মাথায় জোরে এক ঘুঁষি মারল। রবারের পুতুল এত আঠালো যে মাকড়সার ডান হাত আঠায় আটকে গেল, শত চেষ্টা করেও সে খুলতে পারল না। এবার আমি যাব, আমায় যেতে দাও বলে সে চিৎকার করতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই হাত ছাড়াতে পারল না। তখন আরও রেগে বাঁ হাত দিয়ে

তার মাথায় মারল এক জোরালো ঘুঁষি। এবারে এ হাতখানাও নরম আঠালো রবারে আটকে গেল। তখন সে বুঝল ওটা কোনো মানুষ নয়। তখন সে পা দিয়ে ওটাকে ঠেলতে গেল। এবারে পাখানাও আটকে গেল। তার নড়াচড়াও বন্ধ হল।

তখন সে মনে মনে কপাল চাপড়াতে লাগল, হায় হায়, আমি কী বোকা! বোকা আর অলসের এমনই দশাই হয়। সকাল হলে সবাই এখানে এলে জেনে যাবে, আমি একটা চোর।

পরদিন সকালে সেই পাহারাওয়ালা এসে রবারের পুতুল থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রাম প্রধানের সামনে হাজির করল। গ্রাম প্রধান বলল, তুই চোর, সব্বাইকে বলে দেব, তুই বাদাম চুরি করিস।

সেদিন থেকেই মাকড়সা অন্ধকারে মুখ লুকোলো। এত লজ্জা পেয়েছিল যে সে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারত না। তারপরে তার ছেলে, তার ছেলের ছেলে, তারও ছেলে অন্ধকারেই মুখ লুকিয়ে রইল। আলোর জগতে আর তারা ফিরে এল না।

রাজার ভাঁড়

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর কাছে দেশ-বিদেশ থেকে কবি এবং গাইয়ে-বাজিয়ের দল দেখা করতে আসতেন। রাজা তাঁদের গান বাজনা, গল্প কবিতা সব শুনতেন। তবে রাজা খুবই পছন্দ করতেন ওদের মধ্যে একজনকে একটু বেশি। তার নাম সাহ্‌বাউল। নানা রঙ্গ করতে, মজার গান গাইতে, নাচতে তার জুড়ি ছিল না। তাই সবাই তাকে বলত রাজার ভাঁড়।

কিন্তু তার একটা ব্যাপার রাজা একটুও পছন্দ করতেন না—সাহ্‌বাউল খেতে ভীষণ ভালোবাসত আর প্রচুর পরিমাণে খাবার খেত। চেহারায় ছোট্টো খাট্টো, কিন্তু সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটু ফাঁক পেলেই খেতে বসে যেত।

তার কাণ্ড দেখে রাজা ভাবলেন, এভাবে, দিনরাত এমন ঠেসে ঠেসে খেলে তো কঠিন অসুখ হয়ে বেচারি মারা পড়বে।

একদিন রাজামশাই তাঁর লোকজনকে ডেকে বললেন, শোনো, তোমাদের একটা কাজ করতে হবে—সারাদিন সাহ্‌বাউলকে একদানাও খাবার দেবে না। এক ফোঁটা পানীয় দেবে না, এক টুকরো ফল দেবে না। এক খণ্ড মাংস দেবে না। এক টুকরো রুটিও দেবে না। দেখবে, ও যেন আমার সঙ্গে খাবার টেবিলে না বসে। কাল সারাদিন যেন কোনোমতেই ও যেন একদানাও খাবার না পায়।

এক পারিষদ বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ এটাই ঠিক দাওয়াই। লোকটা সত্যিই বিশ্রী মোটা।

পরের দিন রাজার খাবার টেবিলে সাহ্‌বাউলের কোনো জায়গা হল না। কী আর করে সে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে ভাবল—টেবিলে বসতে দেয়নি তো কী হয়েছে, এখুনি ওরা খাবার-পানীয় সবই নিয়ে আসবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, কেউ তো খাবার দাবার আনছে না। ব্যাপারটা কী হল? সাহস করে সে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারছে না। কী জানি রাজা যদি চটে যান? রাজাকে তার ভারি ভয়।

সত্যিই যদি রাজাকে রাগিয়ে দেয়, তবে কী তার আর রক্ষা আছে?

বেচারি সাহ্‌বাউল, তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। এমন সময় এক চাকর তার সামনে এক টুকরো রুটি ফেলে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলে জামার পকেটে রাখল।

ভাবল, এটাই খাই; কিন্তু এখন নয়। রাজামশাইয়ের নজর যখন এদিকে থাকবে না, তখনই খাব।

খাওয়ার পাট চুকল। এবারে কবি কবিতা শোনালেন, গাইয়ের দল গান শোনাল, পরির মতো সুন্দরী মেয়েরা নাচ শুরু করল।

সাহ্‌বাউল ভাবল, এবারে রাজামশাই মেয়েদের নাচ দেখবেন, তখন রুটির টুকরোটা খেয়ে নেব।

রাজামশাই কিন্তু সারাক্ষণ তার দিকে নজর রেখেছেন। এত কবিতা পাঠ হল, গান হল, নাচ হচ্ছে—তবু তিনি তাকে চোখের আড়াল হতে দেননি। এবারে তিনি নাচ বন্ধ করে সাহ্‌বাউলকে কাছে ডাকলেন। তাকে বললেন, শুনেছি তোমার একটা গাধা আছে। কোত্থেকে ওটা জুটিয়েছ?

আজ্ঞে, আমি ওটা ত্রিপোলিতে কিনেছিলাম।

রাজা বললেন, ও, আচ্ছা।

ওদিকে গান শুরু হয়ে গিয়েছিল, মেয়েদের নাচও। সাহ্‌বাউল ভাবছিল, এবারে রুটির টুকরোটা খেতেই হবে। নাড়িভুঁড়ি খিদের চোটে হজম হয়ে গেল।

কিন্তু রাজামশাই তাকে ছাড়েন কই! এবারে তিনি শুধোলেন, আচ্ছা, ত্রিপোলিতে তো গাধা কিনলে, তা কত দাম নিয়েছিল?

সাহ্‌বাউল রুটির টুকরোটা পকেট থেকে আরেকটু হলেই বের করে ফেলেছিল, তা সামলে নিয়ে বলল, আজ্ঞে ষোলো মোহর দিয়ে কিনেছিলাম।

এভাবেই নানা কথায় মেতে থেকে দুপুর পার করে দিলেন রাজামশাই। যখনই সাহ্‌বাউল রুটির টুকরোটা বের করার উপক্রম করে, ঠিক তখনই তিনি তাকে একটা প্রশ্ন করে তার চেষ্টায় জল ঢেলে দেন।

দুপুর গড়িয়ে যখন সন্ধে নামল, তখন সাহ্‌বাউল আর দাঁড়াতে পারে না। এমনিতে সে কাহিল হয়ে পড়েছে, খিদেয় পেটে আগুন জ্বলছে। তখন ভোজের পালা শেষ। সে একছুটে রান্নাঘরে গেল। সেখানে দোরে তালা লাগানো। তার পকেটে তো ছোট্ট একটুকরো রুটি। সেটা খেয়ে সে নিজের ঘরে গেল। কিন্তু খিদের চোটে চোখের দুপাতা এক হল না।

সারাদিন সত্যি বলতে কী, দাঁতে কুটোও কাটেনি। আর সে পারে না। রাত দুপুরে রাজার ঘরে গিয়ে কড়া নাড়ল।

রাজা রাগী গলায় শুধোলেন, কে রে? রাতদুপুরে আমার ঘরে কে কড়া নাড়ে?

রাজামশাই আমি। সাহ্‌বাউল বললে, একটা ভুল হয়ে গেছে। তখন যে বলেছিলাম ত্রিপোলিতে গাধা কিনেছিলাম, সেটা ভুল। আমি আসলে বেনগাজিতে গাধাটা কিনেছিলাম।

তা শুনে রাজা বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাও, এবারে শুয়ে পড়ো।

ক'মিনিট পরে সে আবার ফিরে এসে রাজার দরজায় কড়া নাড়ল।

না রাজামশাই, আপনাকে আরও একটা ভুল বলেছিলাম। গাধার দাম আমি ষোলো মোহর দিইনি। গাধার জন্যে আমার কুড়ি মোহর খরচ হয়েছিল।

তার কথা শুনে রাজামশাই তো রেগে আগুন, বললেন, তোর এই গালগপ্পো শুনে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। দাঁড়া, তোকে কোতল করে আজ তোর শরীরটা শেয়াল কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

রাজার কথা শুনে সে মোলায়েম স্বরে বলল, তা আমি জানি মহারাজ, কিন্তু সবার আগে শেষ ইচ্ছাটা তো পূরণ করবেন। আমার ইচ্ছের কথাটা কি এবারে আপনাকে জানাব—আমার শেষ ইচ্ছে, মানে একমাত্র ইচ্ছে!

রাজা রেগেই বললেন, বলো, শুনি তোর শেষ ইচ্ছেটা কী?

আমার শেষ ইচ্ছে পেট পুরে চমৎকার এক নিশিভোজ খাওয়া।

রাজা সবই বুঝলেন। তিনি হেসে চাকরদের বললেন, যাও, এর জন্যে চমৎকার নিশিভোজের ব্যবস্থা করো। ওর পেট ভরে খাওয়ায় যেন কোনো ফাঁকি না পড়ে।

ভাঁড়ার থেকে সেরা খাবার সাজিয়ে প্লেট পড়ল টেবিলে। শুরু হল সাহ্‌বাউলের খাওয়া। পাশে বসলেন রাজা। গল্প গাথায় খাওয়া এগিয়ে চলল।

না, তারপর থেকে রাজা আর বাধা দেননি। সাহ্‌বাউলের খাওয়া একই রকম চলেছে। তার মনে আর কোনো খেদ নেই।

রুমালের গল্প

একটা মেয়ের কথা বলি। জাকিয়া তার নাম। যেমনি সুন্দরী মেয়ে সে, তেমনি বুদ্ধিমতী। গাঁয়ে সে থাকত তার বাবার সঙ্গে। বাবা বুদ্ধিমতী মেয়ের সব কথা শুনত। নিজে কোনো কিছু করতে হলে মেয়ের পরামর্শ নিত। একবারই সে মেয়ের পরামর্শ না নিয়ে একটি কাজ করেছিল—সেজন্য মেয়ে খুব রাগ করেছিল। তবে সে ব্যাপারে সে পরামর্শ করবে কী? সে তো রাজি হবেই।

হয়েছিল কী—মেয়ের সুখ্যাতি শুনে দেশের রাজামশাই নিজে মেয়ের বাপকে ডেকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। অমন প্রস্তাব কেউ কি ফেরায়? বাপ তো তাঁকে কথা দিয়ে এলেন—মেয়ের পরামর্শ নেবার সুযোগও ছিল না। আর সে ভাবতেও পারেনি এমন প্রস্তাবে কেউ আপত্তি করতে পারে। কিন্তু সত্যিই আপত্তি করল মেয়ে।

বাবার কথা শুনে সে বলল, না বাবা, যে মানুষকে আমি চিনি না, জানি না, ভালোবাসি না, তাকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

শোন্ বাছা শোন্, বাবা বলল, রাজা তোর গুণের কথা শুনে নিজে থেকে বিয়ের কথা বলেছেন। এখন না বললে খুবই রেগে যাবেন। তাছাড়া রাজা দেখতে যেমন সুপুরুষ, তেমনি বুদ্ধিমান। তুই আপত্তি করিস না মা।

শেষে মেয়ে বলল, ঠিক আছে আমি ওঁকে বিয়ে করতে পারি। তবে আমার একটা শর্ত আছে —রাজাকে কোনোও না কোনো হাতের কাজ শিখে নিতে হবে। ধরো, একদিন কোনো কারণে যদি রাজা তাঁর রাজত্ব হারান, তখন তো আমরা গরিব হয়ে যাব। তখন তো না খেয়ে মরব। তেমন দুর্দিনের কথা ভেবেই রাজার একটা হাতের কাজ জানা দরকার। আমার কথা তুমি রাজাকে জানাও। তিনি রাজি হলে তবেই বিয়ে।

বাপ আর কী করে—জাকিয়ার কথা রাজাকে গিয়ে জানাল। তার কথা শুনে রাজা খানিক হাসলেন, তারপরে বললেন, তোমার মেয়ে তো শুধু সুন্দরী নয়, দেখছি বেশ বুদ্ধিমতীও। সে যা বলেছে আমি সেই শর্তেই রাজি। মনে হয়, আমাদের জীবন সুখেরই হবে।

এবারে রাজা সত্যিই তাঁতের কাজ শিখে নিলেন। মাকু চালিয়ে তাঁতে একখানি চমৎকার রুমাল বুনলেন। নিজের হাতে বোনা রুমালটি উপহার হিসাবে জাকিয়ার কাছেই পাঠালেন। মনে মনে ভাবলেন, যদি রুমাল ওর পছন্দ হয়, তাহলে জাকিয়া নিশ্চয় আমায় বিয়ে করতে রাজি হবে।

সে রুমালখানি সত্যিই জাকিয়ার খুব পছন্দ হল, আর এক মাসের মধ্যে মহা ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। শুরু হল সুখের সংসার। কোনো সমস্যায় পড়লে রাজা তার রানির সঙ্গে পরামর্শ করেন দুজনে মিলে সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বের করতেন।

একদিন রাজা এসে বললেন, রানি, আমার রাজ্যের প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে বুঝে নিতে ইচ্ছে করছে। তারা কী ভাবে, তারা কী চায় তা জানতে ইচ্ছে করে। একটা উপায় ঠাউরাও তো—কী ভাবে কাজটা করা যায়।

মিনিট খানেক ভেবে জাকিয়া বলল, রাজা যদি কারও মনের খবর পেতে চাও, তবে তার সঙ্গ করতে হবে, তার সঙ্গে ওঠাবসা করতে হবে। তুমি যদি ওদের সঙ্গে সত্যি মিশতে চাও তবে তোমাকে ওদের মতোই পোশাক পরতে হবে, মন দিয়ে রাস্তার মানুষজন দেখো, তাদের মতো আচার আচরণ শিখে নাও।

রাজা বললেন, ঠিক কথা বলেছ, এই জন্যেই তো তোমার পরামর্শ চাই।

পরদিন সন্ধ্যায় রাজা তাঁর দুই মন্ত্রীকে নিয়ে সাধারণ পোশাক পরে পথে বেরুলেন। ঘুরতে ঘুরতে রাতের খাবারের সময় হয়ে গেল।

রাজা তো প্রজাদের মনের খবর জানতে চান। কাজেই তিনি আর বাড়ি ফিরলেন না, ভাবলেন, একটি কাফিখানায় সকলে মিলে ঢুকলেন। সেখানেই তো সাধারণ মানুষেরা খেতে যায়।

তাঁরা তখন এক গলির ভেতরে ছোটো একটা কাফিখানায় ঢুকলেন। দোকানে ঢুকে গিয়ে তিনজনেই পা পিছলে আছাড় খেলেন। মাটিতে গড়াতে গড়াতে চিৎকার করতে লাগলেন। তাঁদের সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে এল না।

রাজার পক্ষে চমৎকার অভ্যর্থনা হল তো! রাজা বললেন, আমরা কোথায় এসেছি, আর কেনই বা এসেছি?

হঠাৎ একটা হাসির শব্দ শুনে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন, একটি বদখত চেহারার বুড়ো তাঁদের পানে চেয়ে হা-হা-হা শব্দে হাসছে। হাসতে হাসতে সে বলল, তিনদিনের ভেতরেই তোদের কেটে সে মাংস আমার কাফিখানায় বেচব। ওঃ! চমৎকার ডিস হবে? বলেই ফের হা হা হা করে হাসতে হাসতে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

মন্ত্রী দুজনের একজন বললেন, লোকটা ফিরে এলে আমরা বরং নিজেদের পরিচয় ওকে দিই।

না না, সেটা কোনোভাবেই করা যাবে না। আমাদের পরিচয় জানতে পারলে তিনদিন নয়, এখনই আমাদের শেষ করবে। দাঁড়াও, আমি ভেবে দেখি কী করা যায়।

ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাজা ভাবতে শুরু করলেন।

ঘণ্টা কয়েক বাদে সেই বদখত বুড়োটা ফের ফিরে এল। ওপর থেকে জল ভরতি একটা পাত্র নামিয়ে দিয়ে বলল, এখন এই জল খেয়ে প্রাণ ঠান্ডা করো, তোমাদের জন্যে কোনো খাবারের দরকার নেই—বেশ গাবদা গোবদা আছ, খাবার না খেলেও কদিন চলবে।

রাজা বললেন, দেখ বাপু, যদি মরতে হয় তো মরব; তবে তোমায় একটা ছোট্ট কাজের কথা বলতে চাই। এতে অবশ্য তোমার বেশ কিছু টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে।

কাজটা কী এখুনি বলে ফেল। টাকাকড়ি পেতে আমার খুব ভালো লাগে।

রাজা বললেন, আমি একজন তাঁতি। আমার হাতের কাজ রানি সাহেবা খুব পছন্দ করেন। আমি একটা রুমাল তৈরি করব, তুমি সেটা রানির কাছে পৌঁছে দেবে। তাহলে তুমি আরও অনেক টাকা পাবে। তোমার এই কাফিখানায় খাবার বেচে যা পাও, তার চেয়ে ঢের বেশি পাবে।

লোকটা তখন রাজার জন্যে একটা ছোটো তাঁত আর কিছু সুতো এনে দিল। রাজা অল্প সময়ের মধ্যে রানির জন্য একটি চমৎকার রুমাল বুনে ফেললেন। বুড়ো লোকটা সেই রুমাল নিয়ে চলল রানিমার কাছে।

রাজবাড়িতে পৌঁছোলেও রানির কাছে পৌঁছানো খুব সহজ হল না। শেষ পর্যন্ত অনুমতি পেয়ে অন্দরমহলে ঢুকল সে। রানিকে বলল, আমার কাছে একটা চমৎকার রুমাল রয়েছে। দেখুন, এই রুমালটি এক পাকা তাঁতি বুনেছে। আপনি কি এটা কিনবেন?

রুমাল দেখেই জাকিয়া বুঝলেন, রাজা নিশ্চয় কোনো বিপাকে পড়েছেন। তাই রুমালখানি হাতে নিয়েই বললেন, চমৎকার রুমাল তো! আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। অবশ্যই কিনব।

জাকিরা রুমাল কিনল, তবে তার ফাঁকে চাকরদের বলে দিল—ও বুড়োটার পিছু পিছু ক'জনে যাও।

তারা বুড়োর পিছনে এগোল। জাকিরা নিজেই ঘোড়ায় চেপে তাদের অনুসরণ করল। সেই গলিতে এসে বুড়োর পিছনে চাকরেরাও ঢুকল কাফিখানায়। জাকিরা বাইরে অপেক্ষায় রইল।

একটু পরে কাফিখানায় খুব মারামারি শুরু হয়ে গেল। শেষে রাজা তার দুই মন্ত্রীকে নিয়ে কাফিখানার বাইরে এলেন। চাকরেরা কাফিখানার মালিককে খুব পিটেছে।

জাকিয়াকে দেখে, রাজা বললেন, ওঃ, তুমি এসে গেছ। তুমিই আমাদের জীবন বাঁচিয়েছ। পৃথিবীতে তোমার চেয়ে আপনজন আর কেউ নেই।

তা শুনে খুশি হল জাকিয়া।

রাজা-রানি প্রাসাদের পথে রওনা দিলেন।

গোরুর ল্যাজে তৈরি চাবুক

অনেক অনেক অনেককাল আগে আফ্রিকায় বাস করত এক শিকারি। শিকারির নাম ওগালুসা। একদিন সে বনে গেছে শিকার করতে, আর তার বউ পাঁচ ছেলেকে নিয়ে গেছে খেতে—চাষ করতে। সন্ধে নামতে বউ তো ছেলেদের নিয়ে বাড়ি ফিরে এল, কিন্তু ওগালুসা তখনও ফেরেনি। তার অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে রাত গড়িয়ে দুপুর হল—তখনও সে ফিরল না দেখে বাড়ির আর সবাই রাতের খাওয়া শেষ করে ঘুমোতে গেল। সে রাত কেটে গেলেও ওগালুসা ফিরল না। সকাল হল, সে ফিরল না, বিকেল হল, রাত্তির হল, সে ফিরল না। পরের দিনও ফিরল না, তারপরের দিনও না। ক্রমে সপ্তাহ পেরুল, মাস পেরুল, ছমাস পেরুল, ওগালুসা এল না, কিন্তু ঘরে তার ষষ্ঠ পুত্রটি এসে গেল। শেষের ছেলের নাম হল পুলি।

ওগালুসার বউ রোজ খেতে গিয়ে কাজ করে। ছেলেরা তাকে সাহায্য করে, কোনো কোনোদিন ভাইয়েরা কেউ বনে যায় শিকার করতে। এমনি করেই দিন চলে যায়। কিছুদিন পরে বাড়ির লোকেরাও ওগালুসার কথা ভুলে গেল। ততদিনে ছোটোছেলে হাঁটতে শিখেছে। কথা বলতে শেখেনি। তারপরে একদিন সে কথা বলতেও শুরু করল।

তার প্রথম কথাই হল—আমার বাবা কোথায়?

বড়োভাইকে সেদিন জিজ্ঞেস করল, আমাদের বাবা কোথায়?

মেজোভাই বলল, বনে গিয়ে চলো আমাদের বাবাকে খুঁজে দেখি।

সেজোভাই বলল, যে পথে বাবা হেঁটে গিয়েছিল, সে পথ তো আজও রয়েছে।

রাঙাভাই বলল, আমরা সেই পথ ধরেই খুঁজব। আমার স্থির বিশ্বাস, বাবাকে আমরা খুঁজে পাবই।

ফুলভাই বলল, চলো। এখুনি বেরিয়ে পড়ি।

পাঁচ ভাই তাদের বন্দুক নিয়ে বনের পথে পা বাড়াল। পথ ছিল। অনেক অনেক দূর। যেতে যেতে যেতে যেতে তারা এক জায়গায় এসে পৌঁছোলো। সেখানে মাটিতে ওগালুসার হাড়গুলো পড়েছিল, তার বন্দুক পড়েছিল।

বড়োভাই বলল, আমি মন্ত্র দিয়ে হাড়গুলো জুড়ে দিতে পারি।

সে মন্ত্র বলতেই হাড়গুলো ঠিকঠাক জুড়ে একটা মানুষের কঙ্কালের চেহারা নিল।

এবারে মেজোভাই বলল, আমি হাড়ের সঙ্গে চামড়া দিয়ে শরীর ঢাকার মন্ত্র জানি। সে মন্ত্র বলতে তার বাবার কঙ্কালটা এবারে চামড়া-ঢাকা হয়ে অনেকটা মানুষের মতো হল।

সেজোভাই বলল, আমার মন্ত্রে এ শরীরে রক্ত চলাচল শুরু হবে। এবার মন্ত্রে ওগালুসার শরীরে রক্ত চলাচল শুরু হল।

রাঙাভাই বলল আমি ওই শরীরে নিঃশ্বাস বইয়ে দিতে পারি। তার মন্ত্রে সত্যিই ওগালুসার শরীরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বইতে শুরু করল।

ফুলভাই বলল, ভালোই হল, আমি তো শুধু শরীরকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি। এবারে পড়ি সেই মন্ত্র। তার মন্ত্র পাঠ শেষ হতেই ওগালুসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার বন্দুক কই?

ছেলেরা তার হাতে পুরোনো বন্দুকটা তুলে দিল। বন্দুক হাতে ওগালুসসা ছেলের দলের সঙ্গে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরে খুব করে স্নান করে সাজি মাটিতে ঘষে ঘষে গায়ে জমা এতকালের ময়লা সাফ করল। এতকাল ধরে বেড়ে ওঠা লম্বা চুল-দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে চেহারায় ভদ্র ভাব আনল। তারপর মনের সুখে রাতের খাবার শেষ করল। তারপর কয়েকদিন ধরে একটানা বিশ্রাম নিল।

তার ফিরে আসায় বাড়ির লোকেরা তো বটেই, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই খুব খুশি হয়েছিল। ওগালুসা তাঁর প্রতিবেশীদের ভোজ দেবার জন্য এক গোরু কাটল। রান্না করল তার বউ। এতদিন পরে বরকে ফিরে পেয়ে সে ভারি খুশি। সেই গোরুটার ল্যাজ দিয়ে ওগালুসা একটা চাবুক বানাল। সেই চাবুকের হাতলে সে অনেকগুলো রত্ন বসাল—চাবুকটা দেখতে হল চমৎকার।

ভোজ শুরু হল। সবাই তো তার সেরা পোশাক পরেই ভোজে এসেছে। বাজিয়েরা বাজনা শুরু করল। গান জমে গেল। নাচের দল নাচ শুরু করল। একেবারে আনন্দের পরিবেশ।

ওগালুসা এবারে তার নতুন চাবুকখানি অতিথিদের দেখাল।

তারা বলল, ওঃ, এমন সুন্দর চাবুক কখনও দেখিনি। এটা সুন্দরতম-র চেয়েও সুন্দর। তাদের কেউ কেউ চাবুকটা হাতে নিতে চাইল। কিন্তু ওগালুসা কিছুতেই সেটি হাতছাড়া করল না। তারপরে সে বলতে শুরু করল—

অনেকদিন আগে আমি বনে শিকার করতে গিয়েছিলাম। এক ভয়ংকর সিংহ আমায় মেরে ফেলে। অনেককাল আমি মৃত অবস্থায় পড়েছিলাম। তারপর আমার ছেলেরা আমার হাড় খুঁজে পায় এবং আমি জীবন ফিরে পাই। এখন আমি ফের তোমাদের মাঝে ফিরে এসেছি। ছেলেদের ধন্যবাদ জানাই। তোমরা আমার অতিথি। দেখো এই যে চাবুকটা বানিয়েছি, তোমরা বলছ এটা নাকি সবার সেরা। এই সেরা চাবুকটি আমি সেই ছেলেকেই পুরস্কার দিতে চাই, মরণের দেশ থেকে আমার ফিরে আসায় যার অবদান সবচেয়ে বেশি।

সবাই ভাবতে লাগল, কার অবদান বেশি? একজন হাড় জোড়া দিল, একজন তাকে মানুষের চেহারা দিল, একজন রক্ত সঞ্চালন করল, একজন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শুরু করালো, একজন তাঁকে দাঁড় করালো—কার অবদান বেশি! সবাই ভাবছিল। শেষে ওগালুসা বলল, এ পুরস্কার পাবে পুলি—আমার আদরের ছোটো ছেলে। সে তো আমায় দেখেইনি—তবু সে প্রথম কথাটি বলেছে —আমার বাবা কোথায়? তখনই আমার ছেলেদের মাথায় ঢুকেছে বাবাকে খোঁজার কথা। পুলি, তোকে ধন্যবাদ। তোর জন্যেই আমি পরিবারে ফিরেছি, বন্ধুদের কাছে আসতে পেরেছি। এই বলে সে পুলির গালে চুমু খেল।

সবাই বলল—ওগালুসা ঠিক কথাই বলেছে।

আফ্রিকার লোকেরা তাই বলে—একজন ততকালই বেঁচে থাকে, যতদিন লোকে তাকে মনে রাখে।

এক শেয়ালের গল্প

এক শেয়ালের পায়ে একবার একটা কাঁটা বিঁধেছিল। যন্ত্রণায় সারাটা বনপথ সে ও'য়া ও'য়া রবে চিৎকার করে হাঁটল। কী করি—এবারে কী করি—ভাবতে ভাবতে এক বুড়ি-মার সঙ্গে পথে তার দেখা হল। সে বলল, ঠামি, ও ঠামি, আমার পায়ে একটা কাঁটা বিঁধেছে, যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি। তুমি কাঁটাটা তুলে দাও না গো।

বুড়ি-মা তার পায়ের কাঁটা তুলে দিল। সে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। একটু পরেই সে বুড়ি-মার কাছে এসে বলল, ঠামি, আমার কাঁটাটা কোথায়?

বুড়ি মা বলল তা আমি কী করে বলব। কাঁটা আবার কোন্ কাজে লাগে?

আমার কাঁটা কোথায় গেল? শেয়াল চিৎকার করতে লাগল, আমার কাঁটা বড়ো দরকার। আমার কাঁটা আমায় দাও।

বুড়ি-মা আর কী করে? সে বলল, বাছা কাঁটা তো নেই, তবে আমি তোমায় একটা ডিম দিতে পারি।

শেয়াল ডিম নিয়ে ছুটল। ছুটতে ছুটতে সাঁঝবেলায় এক গাঁয়ে এল, গাঁয়ের প্রথম বাড়ির দরজায় ঘা দিল। দুয়ার খুলল একজন।

শেয়াল বলল, ও ভালোমানুষের পো, আজ রাতটুকু কি তোমাদের বাড়িতে ঠাঁই পেতে পারি? এ গভীর রাতে আর কোথায় যাই, আর যা ঠান্ডা পড়েছে বাইরে। জমে যাচ্ছি যে!

লোকটি বলল, এসো এসো, ভেতরে এসো।

শেয়াল ঘরের ভেতরে ঢুকে বলল, আচ্ছা, হাতের ডিমটা কি এই প্লেটে রাখতে পারি?

নিশ্চয়, নিশ্চয়, প্লেটেই তো ডিম রাখবে।

রাতে উঠে শেয়াল ডিমটা খেয়ে তার খোলাটা প্লেটে রেখে দিল।

সকালবেলায় শেয়াল সেই লোকটাকে ধরল, আমার ডিম কী করলে?

আমি তো জানি না। লোকটা জানাল।

তা শুনে শেয়াল চিৎকার করে কাঁদতে লাগল—অ্যাঁ অ্যাঁ—আমার অ্যাত্তো অ্যাত্তো অ্যাত্তো বড়ো ডিমটা নিশ্চয় তুমিই খেয়েছ, আর বলছ জানি না, অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ...

কী আর করে, লোকটা শেষে একটা মুরগি এনে বলল, কী আর হবে, এবারে এই মুরগিটা নিয়ে বিদেয় হও।

শেয়াল এবারে মুরগি নিয়ে ছুটল। ছুটতে ছুটতে সাঁঝবেলায় আরেক গাঁয়ে এল। গাঁয়ের প্রথম বাড়ির দরজায় ঘা দিল। দুয়ার খুলল এক মেয়ে।

শেয়াল বলল, ও ভালো মানুষের ঝি, আজ রাতটুকু কি তোমাদের বাড়িতে ঠাঁই পেতে পারি? এ গভীর রাতে আর কোথায় যাই। আর যা ঠান্ডা পড়েছে বাইরে, জমে যাচ্ছি যে!

মেয়েটি বললে, এসো, এসো, ভেতরে এসো।

শেয়াল ঘরের ভেতরে ঢুকল। বলল, আচ্ছা, হাতের মুরগিটা কোথায় রাখি বলো তো?

মেয়েটি বলল, তোমার মুরগি বরং আমাদের ছাগলের ঘরে থাক।

রাতে উঠে শেয়াল গেল ছাগলের ঘরে। মুরগিটা খেয়ে ফের নিজের ঘরে ফিরে রাত কাটাল। সকালে উঠে মেয়েটিকে বলল, চলো যাই, মুরগিটা নিয়ে আসি।

ছাগলের ঘরে তো মুরগি নেই। তবে মেঝেতে পালক ছড়িয়ে রয়েছে।

তা দেখে শেয়াল চিৎকার করে কাঁদতে লাগল—অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—আমার অত সুন্দর মুরগিটা রাতে তোমার ছাগল খেয়ে সাবাড় করলে গো।

তার কান্না শুনে মেয়েটি আর কী করে। মুরগির বদলে তাকে একটা ছাগলের বাচ্চা দিয়ে দিল। তা পেয়ে মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিয়ে ছাগলছানা নিয়ে ছুটল শেয়াল। ছুটতে ছুটতে সাঁঝবেলায় আরেক গাঁয়ে এল। গাঁয়ের প্রথম বাড়ির দরজায় ঘা দিল। একজন দুয়ার খুলল। সে বলল, আমি ভীষণ ভীষণ ভীষণ ক্লান্ত। আমাকে রাতটুকুর জন্য ঠাঁই দেবে?

লোকটি বলল, ভেতরে এসো।

আমার ছাগল ছানাটি কোথায় রাখি! জিজ্ঞেস করল শেয়াল।

ওকে আমার ছেলের খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখ।

রাতে উঠে শেয়াল ছাগলছানাকে খেল। আর তার হাড়গুলো ছেলের বিছানায় ছড়িয়ে এল।

পরদিন সকালে সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, আমার ছাগলছানাটা কোথায়?

ওরা এবারে ছেলের ঘরে গেল। সেখানে ছেলের বিছানায় শিং আর কিছু হাড় ছড়ানো।

হায় আমার ছাগলছানা, তোর এমন হাল কে করল রে, ওরে ছাগল ছানা—কান্না থামিয়ে শেয়াল বললে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, তোমার ছেলেই আমার ছাগল ছানা খেয়ে সাবাড় করেছে।

লোকটা বলল, আচ্ছা, কান্না থামাও। আমি একটা ছানার বদলে একটা মস্ত ছাগল দিচ্ছি। দোহাই, অকারণে কেঁদো না।

না না—আমি ছাগল চাই না। তোমার ছেলেকে চাই। ছেলেকে দাও।

লোকটা বলল, ঠিক আছে, তাই দেব। যাও, দরজার বাইরে একটু অপেক্ষা করো।

একটু বাদে সে একটা মস্ত বড়ো থলে এনে শেয়ালকে দিল। থলের মুখ বাঁধা। বলল, এই নাও, এই থলেতে ছেলে আছে।

থলে মাথায় নিয়ে শেয়াল ছুটল। অল্প ছুটেই সে হাঁপিয়ে পড়ল, থলেটা বড়ো ভারি।

ছেলেটা দেখি মস্ত বড়ো, শেয়াল ভাবলে, নাকি থলিতে ছেলেই নেই, লোকটা ছেলের বদলে পাথর ভরে দিয়েছে। নাঃ, থলেটা খুলে দেখা যাক।

যেই সে থলের মুখ খুলেছে, অমনি দুটো মস্ত কুকুর থলে থেকে বেরিয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে শেয়ালকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

জাদু-কুমির

একটা গুহা ছিল, তার ওপরের অংশ শুকনো, কিন্তু নীচে ছিল জল। ওপরের শুকনো অংশে অনেক জানোয়ার বাস করত আর নীচের জলে বাস করত এক কুমির। সে জলে থাকতেই ভালোবাসত এবং ঘুমোত। তবে গুহার বাইরেও বেরুত মাঝে মাঝে।

একদিন এক শিকারি তির-ধনুক নিয়ে এসেছিল গুহার কাছে। সে কুমিরকে দেখে ঠিক করল, কুমির শিকার করবে। এই ভেবে সেই কুমিরকে মারবার জন্যে ধনুকে তির জুড়েছে, অমনি চোখে ধাঁধা লেগে গেল, কিছুই আর দেখতে পায় না সে। হাত থেকে তার তির ধনুক পড়ে গেল, অমনি আবার সে দেখার শক্তি ফিরে পেল। সে দেখল, কুমির যেন হাসছে। তা দেখে শিকারি রেগে ফের ধনুক তুলে যেই তির জুড়তে যাবে, তখনই আবার চোখে ধাঁধা লাগল, কিছুই আর দেখতে পায় না।

তখন সে ছুটতে ছুটতে গাঁয়ে ফিরে এল। ফিরে গাঁয়ের লোকেদের বলল, জানো, আজ কী কাণ্ড হয়েছিল। পুব গাঁয়ের জঙ্গলে গিয়েছিলাম। ওখানে এক গুহার বাইরে এক কুমির দেখে তাকে মারবার জন্যে যেই ধনুকে তির জুড়েছি, অমনি চোখে ধাঁধা লেগে গেল, অন্ধ হয়ে গেলাম। কিচ্ছু দেখতে পাইনে। হাত থেকে তির ধনুক যেই খসে পড়ল, অমনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলাম। অবাক কাণ্ড। ফের কুমিরটার দিকে তাক করেছি, অমনি আবার চোখে ধাঁধা লাগল, অন্ধ হয়ে গেলাম।

গাঁয়ের লোকেরা তার কথা বিশ্বাসই করল না। অনেকে আবার পুব গাঁয়ের জঙ্গলে সেই গুহার দিকে চলল তির ধনুক নিয়ে।

তারাও কুমিরটাকে দেখল। সে গুহার বাইরে হাত পা মেলে রোদ পোয়াচ্ছিল। লোকগুলো ধনুক তুলে তির জুড়ে যেই তাক করতে গেল, অমনি অন্ধ হয়ে গেল। শিকারি নির্দেশ দিল—তোমরা ধনুক থেকে তির খুলে নাও। ওরা তির খুলে নিতেই দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেল। এবারে সত্যিই বোঝা গেল, এটা একটা জাদু-কুমির।

কোনো মানুষের সাধ্য নেই আমায় মারা—একথা ভেবে খুশি মনে কুমির তার গুহায় ফিরল। গুহার অন্য জানোয়ারেরাও নিরাপদ বোধ করত। কেউ আর কুমির মারতে আসত না, সেই গুহার জানোয়ারেরা বেশ মজায় ছিল। তারাও খুব মানত কুমিরকে।

একদিন এল এক বন্দুকবাজ শিকারি। তার এক গুলিতে কুমিরের দফা রফা হল। আসলে কুমিরটা তির ধনুকধারীদের বশ করতে পারত—বন্দুকধারীদের বশ করার মন্ত্র সে জানত না।

বানরের হৃৎপিণ্ড

সাগরতীরে ছিল প্রকাণ্ড এক গাছ। যার অর্ধেক ডালপালা ছিল ডাঙায় আর অর্ধেক ছিল জলে। সেই গাছে বাস করত এক বানর। গাছের ডালে ডালে সে সারাদিন খেলে বেড়াত আর যখন তার খিদে পেত, তখন গাছের পাকা মিঠে ফল খেয়ে পেট ভরাত।

ওই সাগরে থাকত একটা হাঙর। একদিন বানর গাছের কিছু মিঠে ফল সাগরের জলে ছুঁড়ছিল। হাঙর সে ফল খেয়ে ভারি খুশি। আর বানরের সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্বও হয়ে গেল। রোজই হাঙর আসে আর বানর তাকে গাছের ফল খাওয়ায়।

হাঙর বলল, দেখো, এই সাগরের জলে এতকাল শুধুমাত্র মাছই আমার খাবার, কিন্তু তোমার দৌলতে এখন মিঠে ফলও খাচ্ছি। খুব ভালো লাগছে।

হাঙরকে বন্ধু পেয়ে বানরেরও ভালো লাগে। ওকেও তো একা একাই থাকতে হয়। তাই সে রোজ সকালে গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে বন্ধুকে ছুঁড়ে দেয়।

হাঙর বলে, ওঃ — তুমি আমায় এত ভালোবাসো, তোমার জন্যে কিছু করতে আমার ইচ্ছে করে। বানর তার কথা শোনে চুপ করে। হাঙর আরও বলে, তোমায় আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব একদিন, আমার ভাইবোনদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। তুমি এমন ভালো ছেলে, আমার বিশ্বাস, ওরাও তোমায় খুব পছন্দ করবে।

এক মিনিট ভেবে বানর বলল, ধন্যবাদ, তুমি আমায় তোমার বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছ। তোমার ভাইবোনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছ। কিন্তু আমি যেতে পারব না ভাই। ঠান্ডা জলে আমার ভারি ভয়। তার ওপর আমি সাঁতার জানি না। আমার এই গাছেই আমি বেশ আছি।

হাঙর বলল, আরে ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো আছি। আমি তোমায় পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাব। তাছাড়া, আমি ধীরে ধীরেই সাঁতার কাটব।

বানর ভাবল, কথা মন্দ নয়, যা গরম পড়েছে আজ, জলের মধ্যে থাকলে আরামই লাগবে। সে বলল, তা হলে চলো যাই।

হাঙরের পিঠে বসল বানর, তারপরে যাত্রা শুরু হল তাদের।

প্রথমে বানর হাঙরের পিঠে উঠতে চায়নি, কারণ হাঙর বড়ো দ্রুত সাঁতার কাটে। কিন্তু জলের ভিতরে চলতে চলতে তার খুব মজা লাগল। বাঃ, চারিদিকে কত যে ছোটো বড়ো নানারঙের মাছ পাশ দিয়ে সাঁতার কেটে ল্যাজ দুলিয়ে চলে যাচ্ছে।

হাঙর জিজ্ঞেস করল, সমুদ্দুর তোমার পছন্দ হয়েছে, বন্ধু? তোমাদের বনের চেয়ে আমাদের জল কী খারাপ?

হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে বৈকি? মজাই লাগছে, আর কতদূর যেতে হবে আমাদের?

না, বেশি দূর নয়। তবে একটা কথা বলি তোমায়। আমাদের রাজার মানে এই সাগরের হাঙরদের রাজার বড়ো অসুখ।

আমাদের বড়ো ডাক্তার বলে দিয়েছে, বানরের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে এ রোগের আসল ওষুধ—এ ওষুধ খেলে রাজার সব রোগ সেরে যাবে। তাই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। একথা তোমায় বলে দিলাম কেন বলো তো? তুমি আমার প্রিয় বন্ধু, তাই।

তা শুনে বেচারি বানরের কান্না পেল, তবু সে নিজেকে সামলে নিল। এখন বেচাল হলেই মুশকিল। তাই ভেবে ভেবে সে নিজেকে বাঁচাবার একটা মতলব ঠাওরাল। হাঙরকে বলল, আচ্ছা বোকা তো তুমি! আমার হৃৎপিণ্ড যে তোমার রাজার ওষুধ তৈরির জন্যে দরকার, একথাটা আগে বলতে হয় তো! দ্যাখো দিকি—হৃৎপিণ্ডটা অকারণ বইতে হয় বলে সেটা আমি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে এলাম। আমরা তো দিনের বেলা এটা গাছের ডালেই ঝুলিয়ে রাখি, রাতের বেলা পরে নিই। এখন তুমি কী করবে? আমায় তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাবে? হৃৎপিণ্ড ছাড়া আমায় দেখলে রাজামশাই কতখানি রেগে যাবেন, তা তুমি বুঝতে পারছ? আমি তোমার বন্ধু বলেই বলছি, রাজার জন্যে আমি তো হৃৎপিণ্ডটা দিতেই চাই, কিন্তু এখন কী করে হবে? সেটা তো গাছে ঝোলানো রয়েছে।

হাঙর বললে, একটা কাজ করলে হয় তো? আমি যদি তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাই, তাহলে গাছ থেকে হৃৎপিণ্ড পেড়ে নিয়ে ফের আমার সঙ্গে আসতে পারো না?

নিশ্চয়ই। বানর বলল, আমি তো সে কথাই ভাবছিলাম। তোমার রাজা হয়তো আর অপেক্ষা করতে চাইবেন না।

এবারে হাঙর পাখনায় জোর দিয়ে দ্রুত সাঁতরাতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা সেই গাছতলায় ফিরে এল। বানর চট্‌ করে লাফিয়ে গাছে উঠে পড়ল। গাছে উঠে বলল, একটু অপেক্ষা করো, আমি হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে এই এলাম বলে।

কিন্তু বানর আর ফিরে এল না। হাঙর গাছের নীচের জলে সাঁতার কেটে সকাল পার করল, দুপুর পার করল, বিকেল এসে গেল, তবু বানর ফিরল না।

তারপরেও বানরের দেখা না পেয়ে সে চিৎকার করে উঠল, বন্ধু তুমি কোথায়? তার কোনো জবাবও এল না।

হাঙর ভাবল, বন্ধু বোধহয় তার হৃৎপিণ্ড খুঁজে পাচ্ছে না। গাছের ডালে কোথায় যে রাখে!

আরও অপেক্ষা করে হাঙর শেষে চিৎকার করতে শুরু করল—বানর বন্ধু, তুমি কোথায়? কখন ফিরবে তুমি? কোনো সাড়া নেই।

আবার হাঁকল হাঙর। বানর, ফিরে এসো বন্ধু।

হঠাৎ বানরের হাসির শব্দ শোনা গেল—

তুমি কি ভাবো, আমি এতখানি বুদ্ধু? আমার হৃৎপিণ্ডটা তোমাদের বদখত মোটা রাজাকে দিয়ে নিজেই মারা পড়ি আর কী।

বোকা হাঙর বলল—তুমি যে বললে তোমার হৃৎপিণ্ড গাছে ঝোলানো আছে।

তা হবে কেন? আমার হৃৎপিণ্ড শরীরে যেখানে থাকবার সেখানেই আছে। সবসময় সেখানেই থাকে। বানর চেঁচিয়ে বলল, এবারে ভেগে পড়ো—আমি আর তোমার বন্ধু নই। এই কথা বলে সে গাছ থেকে একটা মস্ত পাকা ফল হাঙরের নাক লক্ষ করে ছুঁড়ে মারল।